


Vol. 32 | No. 2 | 1989

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

# রবীন্দ্রনাথের কাব্যপাঠ (বিদায় অভিশাপ-চিত্রাঙ্গদা-চিত্রা)

| | |
|---|---|
| Volume | 32 |
| Issue | 2 |
| Year | 1989 |
| ISSN | 0558-1583 |
| eISSN | 3006-886X |
| Author(s) | সৈয়দ আলী আহসান |
| Published online | February 1, 1989 |
| DOI | 10.62328/sp.v32i2.1 |
| Link to article | https://doi.org/10.62328/sp.v32i2.1 |
| Pages | 1-39 |
| Publisher | University of Dhaka |
| Copyright | সাহিত্য পত্রিকা |
| Designed and Developed by | Zobayer Abdullah |

Check for updates

# রবীন্দ্রনাথের কাব্যপাঠ

[ বিদায় অভিশাপ-চিত্রাঙ্গদা-চিত্রা ]

সৈয়দ আলী আহসান

৪.

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রেমকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করেছেন। কখনও দেহ-মিলনের আগ্রহ, কখনও বিরহজনিত আকুলতা, কখনও বিস্মৃত হবার ভয়, কখনও স্মৃতির সাধনা, কখনও কর্ম ও প্রেমাকুলতার দ্বন্দ্ব, কখনও অলৌকিক রহস্য এবং কখনও সকল সন্তাপের শেষে একটি স্বস্তির আরাধনা—এভাবেই নানা বিচিত্র প্রকৃতিতে রবীন্দ্রনাথ প্রেমের ব্যাখ্যা করেছেন। প্রেমের মধ্যে দেহ এবং হৃদয়ের দ্বৈততা রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেছেন। যেখানে দেহ উন্মুখ সেখানে হৃদয় অচেতন, আবার হৃদয় যেখানে উন্মুখ তখন দেহ বিমুখ। এভাবে দেহ ও হৃদয়ের একটি দ্বন্দ্বকে রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছেন অনেক কবিতায় এবং নাট্যকাব্যে। লক্ষ্য করা যায় যে রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব পদাবলীর প্রেমের আপ্যায়নটি গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। মিলন এবং বিরহ নিয়ে বৈষ্ণব পদাবলীর রহস্য, মধুরতা এবং আনন্দ। এই বিরহের স্বরূপ পদকর্তারা এভাবে দিয়েছেন যে হৃদয়ে যখন প্রেমকে ধারণ করা যায় তখন সাক্ষাতের প্রয়োজন হয় না। তাই দেখতে পাই যে পদাবলীতে মাথুরের পদগুলো সবচেয়ে মধুর এবং সুন্দর। শ্রীকৃষ্ণ যখন রাধিকার কাছ থেকে সরে গেলেন সব সময়ের জন্য, তখন রাধিকার হৃদয়-মন্দিরে কানু আশ্রয় গ্রহণ করলেন। চিত্তের প্রকোষ্ঠে আশ্রয়টি এত প্রবল, সুদৃঢ় এবং চিরস্থায়ী ছিল যে বাইরের পৃথিবীর মানুষের বাধা দেবার কিছুই ছিল না। সকল চাঞ্চল্য মুক্ত হয়ে প্রেম তখন স্মৃতিরঞ্জন।

রবীন্দ্রনাথ 'বিদায় অভিশাপ' নামক নাট্যকাব্যে প্রেমের একটি অপূর্ব সুন্দর পরিচয় দিয়েছেন। 'পঞ্চভূত' গ্রন্থে 'কাব্যের তাৎপর্য' প্রবন্ধে তিনি এর বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। কবিতার শিরোদেশে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন

যে দেবগণ কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে বৃহস্পতিপুত্র কচ দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের নিকট থেকে সঞ্জীবনী বিদ্যা শিখবার জন্য তার নিকট গমন করেন। সেখানে সহস্র বৎসর অতিবাহন করে এবং নৃত্য-গীত ও বাদ্যের দ্বারা শুক্রাচার্যের কন্যা দেবযানীর মনোরঞ্জন করে সিদ্ধকাম হয়ে কচ দেবলোকে প্রত্যাগমন করেন। দেবযানীর নিকট থেকে বিদায়কালীন দৃশ্যটি এ নাট্য-কাব্যে বিবৃত হয়েছে। বিদায় দৃশ্যের সংলাপটি সংক্ষেপে নিম্নরূপ : দেব-লোকে তার সহস্র বর্ষের সাধনা সমাপ্ত করে কচ দেবযানীর কাছ থেকে বিদায় নিতে এসেছেন। বলছেন যে, যে বিদ্যা তিনি শিখেছেন সে বিদ্যা তিনি যেন প্রয়োগ করতে পারেন দেবযানীর কাছে সেই আশীর্বাদ তিনি চাচ্ছেন। কিন্তু দেবযানী তাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাচ্ছেন যে আচার্যের কাছে বিদ্যা গ্রহণ ছাড়া গুরুগৃহে তিনি আর কিছু কি পান নি? কিন্তু কচ যখন বলছেন যে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল বিদ্যালাভ করা, অন্য কোন দিকে তাঁর লক্ষ্য ছিল না। সুতরাং তার আর কোন প্রত্যাশা বা কামনা নেই। দেবযানী তখন গুরু-গৃহে বাসকালে যে সমস্ত ঘটনা ঘটেছিল একে একে তার বিবৃতি দিচ্ছেন। কতভাবে দেবযানী কচকে আনন্দিত রাখবার চেষ্টা করেছেন সে-ঘটনাগুলো তিনি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। কচ শেষ পর্যন্ত স্বীকার করছে যে বিদ্যার অতিরিক্ত যা সে পেয়েছে তা প্রকাশ করা তার পক্ষে সম্ভবপর নয়। মর্মের মধ্যে তা রক্তের মত প্রবাহিত হয়, বাইরে তাকে দেখানো চলে না। দেবযানী তখন কচকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে, কচের হৃদয়ে প্রেম যে জেগেছিল তার প্রমাণ দেবযানী পেয়েছে। এবং দেবযানী চায় যে প্রেমের সেই বন্ধন ছিন্ন করে কচ চলে না যায়। তখন কচের মনে দ্বন্দ্ব জেগেছে প্রেম এবং কর্তব্যের মধ্যে। সে বলছে যে, সে সাধনা করেছে বিদ্যা অর্জনের জন্য, সে-সময় প্রেম তার কাছে এসে-ছিল, কিন্তু প্রেম তাকে কর্তব্যচ্যুত করতে পারেনি। কচের বক্তব্য হচ্ছে যে প্রেম হৃদয়ের মধ্যে বিদ্যমান থাকে, চিরস্থায়ী আসন তার হৃদয়ের অভ্যন্তরে। কিন্তু কর্তব্যকে অস্বীকার করে প্রকাশ্যে প্রেমকে গ্রহণ করা উচিত নয়। প্রেম হৃদয়ের নিভৃতেই স্থায়ীভাবে থাকে এবং প্রেমের স্মৃতিগত বেদনার মধ্যে প্রেমের সার্থকতা। কিন্তু দেবযানী এটা মেনে নিতে পারছেন না। বিদায়কে অনিবার্য জেনেও তিনি প্রেমাকুলতা প্রকাশ করেছেন।

কর্তব্যের একটি ধারাবাহিকতা থাকে এবং কর্তব্য নিষ্ঠার শাসনে মূল্য পায়। কর্তব্যচ্যুতি মানুষের জন্য মহা অপরাধ। সুতরাং প্রেমের জন্য

কর্তব্য বিস্মরণ অপরাধ। আবার কর্তব্যের জন্য প্রেমের বিস্মরণও অপরাধ। এই অপরাধবোধের মধ্যে প্রেম ও কর্তব্যের সমন্বয় সাধন প্রয়োজন। 'বিদায় অভিশাপ' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ সে-সমন্বয় সাধনের কথাই বলেছেন। রবীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতার মধ্যে এই ভঙ্গীটি সবসময় প্রাধান্য পেয়েছে।

'বিদায় অভিশাপ' নাট্যরূপে বিবৃত একটি কবিতা। এ-কবিতার মধ্যে আবেগের বিকাশটি খুবই প্রবল। অনেক ক্ষেত্রে শুধুমাত্র আবেগের সঞ্চারিত প্রবাহ কবিতাটিকে আকর্ষণীয় করেছে। যেমন—

**দেবযানী**

আছে মনে
যেদিন প্রথম তুমি আসিলে হেথায়
কিশোর ব্রাহ্মণ, তরুণ অরুণ-প্রায়
গৌরবর্ণ তনুখানি স্নিগ্ধ দীপ্তি-ঢালা
চন্দনে চর্চিত ভাল, কণ্ঠে পুষ্প মালা,
পরিহিত পট্টবাস, অধরে নয়নে
প্রসন্ন সরল হাসি, হেথা পুষ্পবনে
দাঁড়ালে আসিয়া—

**কচ**

তুমি সদ্য স্নান করি
দীর্ঘ আর্দ্র কেশজলে নবশুক্লাম্বরী
জ্যোতিস্নাত মূর্তিমতী উষা, হাতে সাজি,
একাকী তুলিতেছিলে নব পুষ্পরাজি
পূজার লাগিয়া। কহিনু করি বিনতি,
তোমারে সাজে না শ্রম, দেহো অনুমতি
ফুল তুলে দিব দেবী।

**দেবযানী**

আমি সবিস্ময়
সেইক্ষণে শুধানু তোমার পরিচয়
বিনয়ে কহিলে, আসিয়াছি তব দ্বারে,
তোমার পিতার কাছে শিষ্য হইবারে
আমি বৃহস্পতিসুত।

উপরের অংশটুকু শেক্সপীয়রের 'টেমপেস্ট'-এর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, যেখানে মিরাণ্ডা তার জীবনে প্রথম একজন পুরুষকে দেখে অভিভূত বিস্ময়ে মন্তব্য করেছিল যে পৃথিবীতে কত অপরূপ সৃষ্টি রয়েছে। 'বিদায় অভিশাপ'-এ অবশ্য 'টেমপেস্ট'-এর বিস্ময়টি পুরোপুরি ধরা পড়েনি, কিন্তু ব্যবহৃত শব্দে একটি আবেগগত নির্বাচন পরিস্ফুট হয়েছে, টি. এস. এলিয়ট যাকে বলেছেন—'ইমোশনাল প্রেফারেন্সেস'। আবেগ স্বতই তার নিজের বৈশিষ্ট্য অনুসারে শব্দ নির্বাচন করে নেয়। এখানেও তাই ঘটেছে। এই ব্যবহারকে আবেগের প্রতীক হিসেবে আখ্যা দেয়া যায়।

'বিদায় অভিশাপ'-এ কোথাও কোথাও বক্তব্যে আড়ষ্টতা এসেছে। নাটকীয় ভঙ্গী নির্মাণ করতে গিয়ে এবং ছন্দের একটি বিশিষ্ট বৃত্তের মধ্যে বক্তব্যকে বন্দী করতে গিয়ে একটি শিথিল ভঙ্গী নির্মিত হয়েছে—

"হা অভিমানিনী নারী,
সত্য শুনে হইবে কি সুখ ? ধর্ম জানে,
প্রতারণা করি নাই ; অকপট-প্রাণে
অনিন্দ্য অন্তরে তব সাধিয়া সন্তোষ,
সেবিয়া তোমারে যদি করে থাকি দোষ,
তার শাস্তি দিতেছেন বিধি। ছিল মনে,
কব না সে কথা। বলো, কী হইবে জেনে
ত্রিভুবনে কারো যাহে নাই উপকার,
একমাত্র শুধু যাহা নিতান্ত আমার
আপনার কথা। ভালোবাসি কিনা আজ
সে তর্কে কী ফল ? আমার যা আছে কাজ
সে আমি সাধিব।"

'বিদায় অভিশাপ'-এ চরণান্তে মিল রক্ষা করে প্রবহমানতা আনবার চেষ্টা করা হয়েছে। যার ফলে অনেক ক্ষেত্রে মিলটি কষ্টসাধ্য, আড়ষ্ট এবং দুর্বল হয়েছে এবং কবিতার জন্য নিজস্ব কতকগুলো শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যা গদ্যে ব্যবহৃত হয় না। কতকগুলো মিল অনিবার্যভাবেই দুর্বল। যেমন, 'আবরি' এর সঙ্গে 'যদি' এর মিল, 'মাঝে' এর সঙ্গে 'কাজে' এর মিল, 'পড়ে' এর সঙ্গে 'অধরে' এর মিল, 'মাঝে' এর সঙ্গে 'বিরাজে' এর মিল, 'শ্রান্তি' এর সঙ্গে 'কান্তি' এর মিল, 'সুখস্মৃতি' এর সঙ্গে 'গীতি' এর মিল, 'বন' এর সঙ্গে 'জীবন' এর মিল। তাছাড়া কতকগুলো অসহায় মিল আছে। যেমন, 'বিদায়' এর সঙ্গে 'হায়' এর মিল, 'মোরে' এর সঙ্গে 'ধরে' এর মিল,

'হাসে' এর সঙ্গে 'দাসে' এর মিল, 'নাই' এর সঙ্গে 'ছাই' এর মিল। এ সব ত্রুটি রবীন্দ্রনাথ পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ 'চিত্রা'য় কাটিয়ে উঠেছেন। কতকগুলো কারণে যমকঘটিত দুর্বলতাগুলো 'বিদায় অভিশাপ' কবিতায় এসেছে। একটির কথা পূর্বেই বলেছি। প্রবহমানতা এবং অন্ত্যযমক একই সঙ্গে রক্ষা করতে গিয়ে অন্ত্যযমকের দিকে লক্ষ্য ততটা পড়েনি। দ্বিতীয়তঃ কাহিনীর গতিবিধি নির্মাণ এবং দুটি পরস্পর-বিরোধী আবেগের সংঘর্ষকে প্রকাশ করতে গিয়ে কবি অন্ত্যযমককে তেমন গুরুত্ব দেন নি।

'বিদায় অভিশাপ'-এর মধ্যে একটি বিশেষ তত্ত্ব কাজ করেছে বলে মনে হয়। কর্মজীবনে পুরুষের অকৃতার্থতার জন্য নারী দায়ী। প্রেমের এই বিশেষ দিকটি কবি এখানে প্রস্ফুটিত করতে চেয়েছেন। কচ বিদ্যালাভের জন্য শুক্রাচার্যের কাছে এসেছিলেন, বিদ্যালাভ শেষে তিনি তার কর্তব্য সম্পাদন করবেন অর্থাৎ দেবলোকে ফিরে গিয়ে তার বিদ্যাকে প্রয়োগ করবেন। কিন্তু দেবযানী তাকে কর্তব্য থেকে বিমুখ করতে চাচ্ছেন। তিনি কচকে প্রলুব্ধ করছেন যেন কচ তার কর্তব্য বিস্মৃত হয়ে দেবযানীকে নিয়ে অনন্তকাল আনন্দে জীবন-যাপন করেন। কচ এতে রাজী হয়নি। তার সামনে ছিল তার দায়িত্ব, মননশীলতা এবং কর্তব্যবুদ্ধি। প্রেমকে তিনি অস্বীকার করেননি। কিন্তু প্রেমের জন্য কর্মকাণ্ডে অকৃতার্থ হতে চাননি। দেবযানীর কাছে একমাত্র প্রয়োজন ছিল তার প্রেম। তাই তার বক্তব্য হচ্ছে, "তুমি যখন চলে যাবে আমি তখন নিঃসঙ্গ, একাকী লক্ষ্যহীনা থাকব, তখন আমি যেদিকেই চোখ ফেরাব; সহস্র স্মৃতি আমাকে কাঁটার মত বিদ্ধ করবে। যে ভালবাসা তোমার জন্য আমার ছিল, তার সমস্ত মহিমা তুমি ধূলায় লুটিয়ে দিয়েছ। আমি তাই তোমাকে অভিশাপ দিচ্ছি যে-বিদ্যার জন্য তুমি আমাকে অবহেলা করেছ, সে-বিদ্যা সম্পূর্ণ তোমার বশ হবেনা। তুমি শুধু তার ভারবাহী হয়ে থাকবে। তুমি সে-বিদ্যা শেখাতে পারবে কিন্তু প্রয়োগ করতে পারবে না।" দেবযানীর উক্তি নিম্নরূপ :

"তোমা— 'পরে
এই মোর অভিশাপ—যে বিদ্যার তরে
মোরে কর অবহেলা সে বিদ্যা তোমার
সম্পূর্ণ হবে না বশ; তুমি শুধু তার
ভারবাহী হয়ে রবে, করিবে না ভোগ;
শিখাইবে, পারিবে না করিতে প্রয়োগ।"

৫.

'বিদায় অভিশাপ'-এর পরে 'চিত্রা'র কাব্যধারায় আসার পূর্বে 'চিত্রাঙ্গদা' কাব্যনাট্য আলোচনা করা প্রয়োজন। 'সঞ্চয়িতা'য় 'চিত্রাঙ্গদা' নেই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাব্যপ্রবাহে শব্দ-ব্যবহারের কুশলতা পরীক্ষার ক্ষেত্রে চিত্রাঙ্গদা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, সে কারণে এখানে আমরা 'চিত্রাঙ্গদা'র আলোচনা করছি। রবীন্দ্র-রচনাবলীতে 'চিত্রাঙ্গদা'র ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ যে কথাগুলো বলেছেন তা উদ্ধৃতিযোগ্য—"সুন্দরী যুবতী যদি অনুভব করে যে সে তার যৌবনের মায়া দিয়ে প্রেমিকের হৃদয় ভুলিয়েছে তাহলে সে তার স্বরূপকেই আপন সৌভাগ্যের মুখ্য ভাগে বসাবার অভিযোগে সতিন বলে ধিক্কার দিতে পারে। এ যে তার বাইরের জিনিস, এ যেন ঋতুরাজ বসন্তের কাছ থেকে পাওয়া বর, ক্ষণিক মোহ-বিস্তারের দ্বারা জৈব উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবার জন্যে যদি তার অন্তরের মধ্যে যথার্থ চারিত্রশক্তি থাকে তবে সেই মোহমুক্ত শক্তির দানই প্রেমিকের পক্ষে মহৎ লাভ, যুগল জীবনের জয়যাত্রার সহায়। সেই দানেই আত্মার স্থায়ী পরিচয়, এর পরিণামে ক্লান্তি নেই, অবসাদ নেই, অভ্যাসের ধূলিপ্রলেপে উজ্জ্বলতার মালিন্য নেই। এই চারিত্রশক্তি জীবনের ধ্রুব সম্বল, নির্মম প্রকৃতির আশু প্রয়োজনের প্রতি তার নির্ভর নয়। অর্থাৎ এর মূল্য মানবিক, এ নয় প্রাকৃতিক।"

অন্য একটি তত্ত্ব এ নাট্যকাব্যের মধ্যে প্রবহমান বলে মনে হয়। তা হচ্ছে : প্রেমের অঙ্গীকার এবং ব্যাখ্যা নিয়ে পুরুষ এবং রমণীয় আবেগগত তারতম্য। পুরুষের কল্পনায়, চিন্তায় এবং বেদনায় নারীর একটি প্রবল অস্তিত্ব আছে। এ অস্তিত্বের একটি প্রধান অংশ পুরুষের সীমিত, স্বল্পাংশ-টুকুমাত্র নারীর নিজস্ব। পুরুষ তার কল্পনা ও স্বপ্নের প্রয়োজনে রমণীর সুফলতার কথা ভাবে না। সে তার প্রেমের কুশলতার জন্য সূক্ষ্ম স্বার্থের যে আবহ নির্মাণ করে তার মধ্যেই আজীবন বাস করতে চায়। পুরুষ প্রেমিক, রমণী গুহাশ্রয়ী। তাই যখন পুরুষ বিচিত্র জিজ্ঞাসায় উদগ্রীব আকাঙ্ক্ষায়, কখনও সফলতায় কিন্তু অধিকাংশ সময়ে বিফলতার ইচ্ছায় প্রেমকে অনুভব করতে চায়, রমণী তখন একটি সফলতার মধ্যে এবং সম্ভাবনার মধ্যে নিজেকে ন্যস্ত করতে চায়। পুরুষচিত্ত প্রেমের উত্তেজনায় কখনও সাগর কখনও আগুন কিন্তু রমণী চিরকাল নম্র আশ্রয়ের মাধুর্যে উদ্যানলতা। নারীর জীবনে প্রেম একটি প্রয়োজনের নির্ভরতা কিন্তু পুরুষের প্রেম একটি অন্তর্দাহ। সে রমণীর মধ্যে একটি প্রেমকে প্রত্যক্ষ করে

এবং যে কোনও রমণীর প্রেমকে উপলক্ষ করে প্রেমেরই প্রেমাস্পদ হয়। সহজ ভাষায় সে ভালবাসাকেই ভালবাসে, তাই তার আকাঙ্ক্ষা অতলস্পর্শী। তাই সর্বনাশের মধ্যে সে অকুতোভয়। তাই চিরকালের সূর্যের মত সে তাপ ও দাহনের নায়ক।

পুরুষ তার প্রেমের প্রয়োজনে রমণীকে আপন জিজ্ঞাসার উত্তররূপে নির্মাণ করতে চায়। স্বপ্নের বিভ্রমের মতো রমণীমূর্তি বিচিত্ররূপে তার দৃষ্টিতে তরঙ্গিত হয়। যেরূপে রমণীকে সে নির্মাণ করতে চায়, তাই কি রমণীর যথার্থ রূপাভিব্যক্তি ? তা নয়, কিন্তু বিস্ময়ের কথা এই যে রমণী চিরকাল পুরুষের ইচ্ছাকে প্রসারিত হতে দেয় কিন্তু গৃহাশ্রয়ের আকাঙ্ক্ষা ছাড়া নিছক প্রেমের আনন্দে আপন ইচ্ছাকে মুক্ত করে না—শাসন করে। পুরুষ যেখানে আপন হৃদয়কে সম্পূর্ণ উন্মোচিত করে, রমণী সেখানে নয়নে সম্মোহন ছড়ায় কিন্তু চিত্তকে উদ্ঘাটিত করে না।

'চিত্রাঙ্গদা'র গল্পটি সংক্ষেপে বর্ণনা করছি : মনিপুর-রাজ-দুহিতা চিত্রাঙ্গদা ছিল পুরুষের মত। দেব উমাপতি তার পিতাকে বর দিয়েছিল যে তার ঘরে কোন কন্যা জন্মগ্রহণ করবে না। কিন্তু সেই বরকে ব্যর্থ করে চিত্রাঙ্গদার জন্ম হয়। পিতা তাকে পুরুষের বেশে যুবরাজরূপে লালন-পালন করতে থাকেন। তার শরীরে পৌরুষ কাঠিন্য এসেছিল এবং রমণীর কোন পেলবতা তার মধ্যে ছিল না। একদিন চিত্রাঙ্গদা আকস্মিক ভাবে অর্জুনকে দেখে এবং অর্জুনের যৌবনময় শরীর দেখে সঙ্গে সঙ্গেই মুগ্ধ হয়। কিন্তু অর্জুন তার দিকে দৃষ্টিপাত করে না। তখন চিত্রাঙ্গদা অনঙ্গ আশ্রমে মদনের কাছে গিয়ে বর প্রার্থনা করে। সে লাবণ্যময়ী রমণীরূপে যৌবনের উন্মাদনায় অর্জুনকে ভুলাতে চায়। মদন তাকে বর দেয়। এক বৎসরের জন্য সে বর লাভ করে। এই একটি বছর চিত্রাঙ্গদার নিজস্ব স্বরূপ বিসর্জিত হবে এবং সে লাস্যময়ী রমণীরূপে আবির্ভূতা হয়ে অর্জুনকে বশীভূত করবে। অর্জুন এই ফাঁদে ধরা পড়লো এবং চরম উন্মাদনায় এবং দেহ-উপভোগের পরম লাস্যে সময় কাটাতে লাগলো। কিন্তু চিত্রাঙ্গদা মর্মপীড়ায় পীড়িত হতে লাগলো। যে শরীরকে দিয়ে সে অর্জুনকে বশীভূত করেছে সে-শরীর তো তার নয়। তার মধ্যে দ্বন্দ্ব লাগলো শরীর এবং মনের। অবশেষে বৎসর যখন অতিক্রান্ত হল তখন চিত্রাঙ্গদা স্বরূপে আবির্ভূত হয়ে অর্জুনকে বলল :

"আমি চিত্রাঙ্গদা।
দেবী নহি, নহি আমি সামান্যা রমণী।
পূজা করি রাখিবে মাথায়, সেও আমি
নই, অবহেলা করি পুষিয়া রাখিবে
পিছে, সেও আমি নহি। যদি পার্শ্বে রাখ
মোরে সংকটের পথে, দুরূহ চিন্তার
যদি অংশ দাও, যদি অনুমতি কর
কঠিন ব্রতের তব সহায় হইতে,
যদি সুখে দুঃখে মোরে কর সহচরী
আমার পাইবে তবে পরিচয়।"

মহাভারতে চিত্রাঙ্গদা ও অর্জুনের একটি ক্ষুদ্র কাহিনী আছে। সে-কাহিনীকে অবলম্বন করেই রবীন্দ্রনাথ এই কাব্যনাট্যটি লিখেছেন। নর-নারীর শরীরী প্রেম এবং যৌন অনুরাগ এই কবিতায় রূপলাভ করেছে। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু দেহগত বুভুক্ষাকে স্পর্শ করেছেন কিন্তু তাকে সৌন্দর্যের স্বর্গের মধ্যে উপস্থাপিত করেছেন। এ কাব্যের অসাধারণতা হচ্ছে যে কবি শব্দ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে সৌন্দর্যের আবেগকে মূর্ত করতে সক্ষম হয়েছেন। যে ত্রুটিটি আমরা 'বিদায় অভিশাপ'-এ লক্ষ্য করেছি এ কাব্যে সে-ত্রুটি নেই। শব্দ, বিশেষ করে তৎসম শব্দ অপূর্ব মাধুর্যমণ্ডিত হয়ে একটি প্রেমের উদ্দীপনাকে প্রকাশ করেছে।

সমগ্র 'চিত্রাঙ্গদা' কাব্যনাট্যটি চিত্ররূপময়। বিভিন্ন ঘটনা এবং অবস্থার যে বিবরণ আমরা পাই তার সবগুলোই চিত্রাংকনের মাধ্যমে উপস্থাপিত হতে পারে। শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'চিত্রাঙ্গদা'র জন্য অনেকগুলি ছবি আঁকেন। সেই ছবিগুলি পেয়ে, রবীন্দ্রনাথ আনন্দিত হন এবং 'চিত্রাঙ্গদা' কাব্যনাট্যটি অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামে উৎসর্গ করেন। উৎসর্গপত্রে রবীন্দ্রনাথ লেখেন, "তুমি আমাকে তোমার যত্নরচিত চিত্র উপহার দিয়েছ, আমি তোমাকে আমার কাব্য ও স্নেহ-আশীর্বাদ দিলাম।"

'চিত্রাঙ্গদা'য় আমরা রবীন্দ্রনাথের শব্দ ব্যবহারের একটা বিশেষ কৌশল অনুভব করি। শব্দ তার নিজস্ব অর্থ নিয়ে বিদ্যমান নেই, কিন্তু অনুভূতির স্বাক্ষর হিসেবে উপস্থিত হয়েছে। স্পর্শের একটি অনুভূতি আছে, যে অনুভূতির সাহায্যে দেহ-চৈতন্য লভ্য হয়, তার পরিচয় 'চিত্রাঙ্গদা' কাব্যনাট্যের দ্বিতীয় পর্বে আমরা পাই। মনিপুরের অরণ্যে যেখানে শিবালয় সেখানে অর্জুন

চিত্রাঙ্গদা দর্শনের পর স্বগতোক্তি করছে যে সে যখন চিত্রাঙ্গদাকে দেখলো তখন চিত্রাঙ্গদা সরোবর-তীরে নেমে আপন মুখচ্ছায়া কৌতূহলে দেখছিল। এখানকার বর্ণনাটি শব্দ-মাধুর্যে দুর্লভ ও অনিন্দ্যসুন্দর। উদ্ধৃতিটি দীর্ঘ হলেও আমি প্রয়োজনবোধে এখানে তা উপস্থিত করছি:

নামি ধীরে সরোবরতীরে
কৌতূহলে দেখিল সে নিজ মুখচ্ছায়া;
উঠিল চমকি। ক্ষণ পরে মৃদু হাসি
হেলাইয়া বাম বাহুখানি, হেলা ভরে
এলাইয়া দিলা কেশপাশ; মুক্ত কেশ
পড়িল বিহ্বল হয়ে চরণের কাছে।
অঞ্চল খসায়ে দিয়ে হেরিল আপন
অনিন্দিত বাহুখানি—পরশের রসে
কোমল কাতর, প্রেমের করুণামাখা।
নিরখিলা নত করি শির, পরিস্ফুট
দেহতটে যৌবনের উন্মুখ বিকাশ।
দেখিলা চাহিয়া নব গৌরতনুতলে
আরক্তিম আলজ্জ আভাস; সরোবরে
পা-দুখানি ডুবাইয়া দেখিয়া আপন
চরণের আভা। বিস্ময়ের নাই সীমা।
সেই যেন প্রথম দেখিল আপনারে।

—দেহস্পর্শের অনুভূতি অর্থাৎ তনুদেহের সলজ্জ স্পর্শকাতরতা, যৌবনের উন্মুখ বিকাশপরায়ণতা এবং দেহ-উপভোগের ইচ্ছার পরিচয় অপূর্ব ব্যঞ্জনায় প্রকাশ পেয়েছে। শব্দ তার পরিধি অতিক্রম করে যৌবনকে অকুণ্ঠিতভাবে রঙময় করেছে।

'চিত্রাঙ্গদা'য় ইচ্ছা প্রকাশকে রূপ দেবার জন্য কবি সাধারণ কয়েকটি ক্রিয়াপদকে অপূর্ব গুরুত্ব দিয়েছেন। চিত্রাঙ্গদা অর্জুনকে প্রথম দর্শনের পর অনঙ্গ-আশ্রমে মদনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে নিজের কতকগুলো ইচ্ছা ব্যক্ত করছে, বলছে যে যদি তার সময় থাকতো তবে তিলে তিলে সে অর্জুনকে অধিকার করতো, দেবতার কোন সহায়তা কামনা করতো না। সঙ্গীরূপে সাথে থাকতো, রণক্ষেত্রে সারথি হতো, মৃগয়াতে অনুচর হতো, শিবিরের দ্বারে রাত্রির প্রহরীরূপে জাগতো, ভক্তরূপে পূজা করতো, ভৃত্য-রূপে সেবা করতো এবং আর্ত-পরিত্রাণে সখারূপে অর্জুনের সহায় হতো।

এই কয়েকটি ইচ্ছাকে কবি অত্যন্ত সাধারণ কয়েকটি ক্রিয়াপদের সাহায্যে বর্ণনা করেছেন বটে, কিন্তু এই সাধারণ ক্রিয়াপদগুলিও অসাধারণ হয়ে উঠেছে ইচ্ছার বর্ণাঢ্যতায় :

সময় থাকিত যদি একাকিনী আমি
তিলে তিলে হৃদয় তাঁহার করিতাম
অধিকার, নাহি চাহিতাম দেবতার
সহায়তা। সঙ্গীরূপে থাকিতাম সাথে.
রণক্ষেত্রে হতেম সারথি, মৃগয়াতে
রহিতাম অনুচর, শিবিরের দ্বারে
জাগিতাম রাত্রির প্রহরী, ভক্তরূপে
পূজিতাম, ভৃত্য রূপে করিতাম সেবা,
ক্ষত্রিয়ের মহাব্রত আর্ত পরিত্রাণে
সখারূপে হইতাম সহায় তাঁহার।

উপরের উদ্ধৃতিতে 'করিতাম', 'চাহিতাম', 'থাকিতাম', 'রহিতাম,' 'জাগিতাম' এবং 'হইতাম'—এ কটি ক্রিয়াপদের ব্যবহার লক্ষযোগ্য। যেহেতু এখানে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে কয়েকটি ইচ্ছার উপর, সে কারণে সে কয়টি ইচ্ছার প্রতিনিধিরূপে এ সমস্ত ক্রিয়াবাচক শব্দগুলো এসেছে। শব্দগুলো নিজস্ব সত্তায় অত্যন্ত দুর্বল, কিন্তু এখানে অত্যন্ত মোহনীয় রূপে প্রকাশ পেয়েছে। শব্দের নিজস্ব দুর্বলতা এখানে অনুভব করা যায় না।

আসঙ্গ মিলনের যে পরিচিতি কাব্যের তৃতীয় অংশে এসেছে তা অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর। এখানে চিত্রাঙ্গদা মদনের কাছে অর্জুনের সঙ্গে তার দেহ-মিলনের বিবরণ দিচ্ছে। বিবরণটিতে আমরা দেহস্পর্শের সচকিত অনুভূতিকে প্রত্যক্ষ করি :

দাঁড়ানু উঠিয়া। মিথ্যা শরম সংকোচ
খসিয়া পড়িল শ্লথ বসনের মতো
পদতলে। শুনিলাম, "প্রিয়ে, প্রিয়তমে!"
গম্ভীর আহ্বানে, মোর এক দেহ মাঝে
জন্ম জন্ম শতজন্ম উঠিল জাগিয়া।
কহিলাম, "লহ, লহ, যাহা কিছু আছে
সব লহ জীবনবল্লভ!" দুই বাহু
দিলাম বাড়ায়ে।—চন্দ্র অস্ত গেল বনে

অন্ধকারে ঝাঁপিল মেদিনী। স্বর্গমর্ত্য
দেশকাল দুঃখ সুখ জীবনমরণ
অচেতন হয়ে গেল অসহ্য পুলকে।

'চিত্রাঙ্গদা' কাব্যনাট্যে রবীন্দ্রনাথ পয়ারের অমিত্রাক্ষর রূপটি গ্রহণ করেছেন। অন্ত্যমিল রহিত করে যে প্রবহমানতা তিনি নির্মাণ করেছেন তা বিষয়োপযোগী হয়েছে। বিষয়টির আবেগ-চাঞ্চল্য, প্রাণময়তা এবং অনিবার্যতা শব্দের সাহায্যে একটি সুন্দর লাবণ্যময় প্রবহমানতা নির্মাণ করেছে যার তুলনা বাংলা কাব্যে বিরল। 'বিদায় অভিশাপ'-এর মধ্যে অন্ত্যমিল রক্ষা করার ফলে দ্বিধাগ্রস্থতা এসেছিল। 'চিত্রাঙ্গদা'য় সে দ্বিধা-গ্রস্থতা রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠেছেন। 'বিদায় অভিশাপ'-এ একপক্ষের আবেগটাই প্রবল, কিন্তু অন্যপক্ষ অনেকটা নিষ্ক্রিয়, কিন্তু 'চিত্রাঙ্গদা'য় আবেগটি উভয়তঃ যার ফলে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কাব্যনাট্যটিতে একটি দ্বিধাহীন গতি এসেছে। এই কারণেই প্রমথ চৌধুরী 'চিত্রাঙ্গদা'কে একটি 'রাগিণী'র সঙ্গে তুলনা করেছেন।

'চিত্রাঙ্গদা'য় রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন অনুভূতি প্রকাশের জন্য প্রকৃতির দ্বারস্থ হয়েছেন। এগুলো অত্যন্ত সুন্দর এবং যথার্থ হয়েছে। একটি উদাহরণ উপস্থিত করছি :

প্রশ্ন কেন? তবে কি আনন্দ মিটে গেছে?
যা দেখিছ তাই আমি, আর কিছু নাই
পরিচয়। প্রভাতে এই-যে দুলিতেছে
কিংশুকের একটি পল্লব প্রাপ্ত ভাগে
একটি শিশির, এর কোন নামধাম
আছে? এর কি শুধায় কেহ পরিচয়।
তুমি যারে ভালোবাসিয়াছ, সে এমনি
শিশিরের কণা, নামধাম হীন।

আর কয়েকটি উদাহরণ উপস্থিত করছি, যেমন—

১. যারে বাঁধিবারে চাও
কখনো সে বন্ধন জানেনি। সে কেবল
মেঘের সুবর্ণছটা, গন্ধ কুসুমের
তরঙ্গের গতি।

২. হায় হায়, এখন বুঝিনু পুষ্প
স্বল্প পরমায়ু দেবতার আশীর্বাদে।
গত বসন্তের যত মৃত পুষ্প সাথে
ঝরিয়া পড়িত যদি এ মোহন তনু
আদরে মরিত তবে।

৩. এর পরে
বার বার আসিয়ো না স্মৃতির কুহকে
ফিরে ফিরে, গত সায়াহ্নের চ্যুতবৃন্ত
মাধবীর আশে তৃষিত ভৃঙ্গের মতো।

৪. এস নাথ, ওই দেখো
গাঢ়চ্ছায়া শৈলগুহামুখে, বিছাইয়া
রাখিয়াছি আমাদের মধ্যাহ্নশয়ন,
কচি কচি পীতশ্যাম কিশলয় তুলি
আর্দ্র করি ঝরনার শীকরনিকরে।

৫. শিলাখণ্ডে স্তরে স্তরে
সরস সুস্নিগ্ধ সিক্ত শ্যামল শৈবাল
নয়ন চুম্বন করে কোমল অধরে।

রবীন্দ্রনাথ এ-কাব্যনাট্যে সমকালীন বাণীবন্ধ এবং শব্দ-ব্যবহার প্রক্রিয়া বিপুল পরিমাণে এড়াতে সক্ষম হয়েছেন কিন্তু সর্বাংশে পরিহার করতে পারেন নি। 'করয়ে', 'বারেক', 'তরে', 'পশিল', 'প্রস্ফুটিয়া' ইত্যাদি সমকালীন কাব্যগত শব্দ ব্যবহার এখানে পাওয়া যায়। সমকালীন প্রথাগত একটি দুর্বল অনুপ্রাসও পাঠকের শ্রুতি এড়াবে না—

ধন্য সেই মুগ্ধ মূর্খ ক্ষীণতনুলতা
পরাবলম্বিতা লজ্জা-ভয়ে-লীনাঙ্গিনী
সামান্য ললনা

এ অনুপ্রাসটি চন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়-এর "সৌন্দর্য লীলাময়ী ললনার লাবণ্য-রাশি" অনুপ্রাসটির কথা মনে করিয়ে দেয়।

সমস্ত কিছু মিলিয়ে 'চিত্রাঙ্গদা' শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ প্রজ্ঞা, বুদ্ধি এবং আবগের পরিচয় বহন করছে। 'চিত্রা' কাব্যগ্রন্থে

পেঁছিতে হলে 'চিত্রাঙ্গদা' পাঠ একজন পাঠকের জন্য একান্ত প্রয়োজন। আমরা সে-কারণেই 'চিত্রা'র পাঠ উন্মোচনের পূর্বে 'চিত্রাঙ্গদা'য় অভিনিবেশ করেছি।

৬.

'সোনার তরী'র পরে 'নদী' নামক একটি কবিতা পুস্তক আকারে প্রকাশিত হয়। কবিতাটি বিশেষ তাৎপর্যবহ নয়। কবিতাটি মূলতঃ বালক-বালিকাদের পাঠের জন্য রচিত হয়েছিল। এর একটি সহজ সাবলীল ছন্দ আছে যা শিশুরা সহজেই আবৃত্তি করতে পারে। প্রত্যেক বছরের আরম্ভে একটি ফাঁক রাখা হয়েছে সেখানে স্বল্প মাত্র থেমে পরবর্তী অংশ দ্রুত আবৃত্তি করতে হবে। কবিতাটির মধ্যে একটি নদীর যাত্রাপথ বর্ণিত হয়েছে। শিশুর মন তুষ্ট করবার জন্য নদীর এই যাত্রাপথটি প্রাকৃতিক বিবরণের সাহায্যে সুন্দর ও আকর্ষণীয় করা হয়েছে। 'নদী' প্রকাশিত হয় ১৩০২ সালে। 'চিত্রা' কাব্য-গ্রন্থটিও প্রকাশিত হয় ১৩০২ সালে।

রচনাবলী সংস্করণে 'চিত্রা' কাব্যগ্রন্থটির একটি ভূমিকা রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন। উক্ত ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "আমার একটি যুগ্মসত্তা আমি অনুভব করেছিলুম যেন যুগ্ম নক্ষত্রের মতো, সে আমারই ব্যক্তিত্বের অন্তর্গত, তারই আকর্ষণ প্রবল। তারই সংকল্প পূর্ণ হচ্ছে আমার মধ্য দিয়ে, আমার সুখে দুঃখে, আমার ভালোয় মন্দয়। এই সংকল্প-সাধনায় এক আমি যন্ত্র এবং দ্বিতীয় আমি যন্ত্রী হতে পারে, কিন্তু সংগীত যা উদ্ভূত হচ্ছে—যন্ত্রেরও স্বকীয় বিশিষ্টতা তার একটি প্রধান অঙ্গ। পদে পদে তার সঙ্গে রফা করে তবেই দুয়ের যোগে সৃষ্টি। ...পরমদেবতার পূজা যুগ্মসত্তায় মিলে, এক সত্তায় ভিতর থেকে আদর্শের প্রেরণা, আর এক সত্তায় বাহিরে কর্মযোগে তার প্রকাশ। সংসারে এই দুই সত্তার বিরোধ সর্বদাই ঘটে, নিজের অন্তরে পূর্ণতার যে অনুশাসন মানুষ গূঢ়ভাবে বহন করছে তার সম্পূর্ণ প্রতিবাদে জীবন ব্যর্থ হয়েছে এ দৃষ্টান্তের অভাব নেই। নিজের মধ্যে নিজের সামঞ্জস্য ঘটতে পারেনি, এই ভ্রষ্টতা মানুষের পক্ষে সবচেয়ে শোচনীয়। আপনার দুই সত্তার সামঞ্জস্য ঘটেছে কিনা এই আশঙ্কাসূচক প্রশ্ন চিত্রার কবিতায় অনেকবার প্রকাশ পেয়েছে। বস্তুত চিত্রায় জীবনরঙ্গভূমিতে যে মিলননাট্যের উল্লেখ হয়েছে তার কোন নায়ক-নায়িকা জীবের সত্তার বাইরে নেই, এবং তার মধ্যে কেউ ভগবানের স্থানাভিষিক্ত নয়। মানুষের

আত্মিক সৃষ্টি কেন, প্রাকৃতিক সৃষ্টিতেও আদিকাল থেকে মূল আদর্শের সঙ্গে বাহ্য প্রকাশের সাংঘাতিক দ্বন্দ্ব দেখতে পাওয়া যায়। আঙ্গারিক যুগের শ্রীহীন গাছপালা কেন টিকতে পারতো না। আজ পরবর্তী গাছগুলি সমস্ত পৃথিবীতে দিয়েছে শোভা। কোন্ শিল্পী রচনার সূত্রপাতে প্রথম ব্যর্থ হয়েছিল মাথা নেড়েছিল, হাতের কাজ নিষ্ঠুরভাবে মুছতে মুছতে সংস্কার সাধন করেছে —এ কথা যখন ভাবি তখন সৃষ্টির ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে দুই সত্তার মিলনচেষ্টা দেখতে পাই। সেই চেষ্টা কী নিষ্ঠুরভাবে নিজেকে জয়যুক্ত করতে চায়, মানুষের ইতিহাসে বারংবার তার প্রমাণ পাওয়া যায়; আজ তার সেই আত্ম-ঘাতী প্রমাণ যেমন প্রকট হয়েছে এমন আর হয়নি।"

কবি বলতে চেয়েছেন যে একজন কবি অথবা শিল্পীর দুটি অস্তিত্ব থাকে—একটি হচ্ছে তার অন্তর্লোক, অপরটি হচ্ছে তার বহির্লোক। এই উভয়ের সমন্বয়েই সৌন্দর্য রূপলাভ করে। বাইরে যার প্রকাশ তা হচ্ছে বিচিত্র রূপ-রস-গন্ধময় ধরিত্রী। অন্তরে এরই প্রকাশ একাকীরূপে। এই দুই ধারার প্রবাহে কাব্যসৌন্দর্য সম্পূর্ণ হয়। অর্থাৎ এক দিকে কর্মজীবনের বিচিত্র আহ্বান রয়েছে, অন্যদিকে নিভৃতে সৌন্দর্য সাধনা রয়েছে। এ দুটি একে অন্যের কাছ থেকে ভিন্ন নয়। কারণ বহির্লোক অন্তর্লোকের কাছে থেকেই প্রেরণা লাভ করে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "আকাশ এবং ভূতলকে নিয়ে ধরণী যেমন সত্য", অন্তর্লোক এবং বহির্লোকের সমন্বয়ে কবি-সত্তাও তেমনি সত্য।

'চিত্রা'র প্রথম কবিতাটি মূল কাব্যের প্রবেশকরূপে অভিব্যক্ত। এখানে তিনি বহির্লোকের এবং অন্তর্লোকের ব্যাখ্যা উপস্থিত করেছেন। সৌন্দর্যের একটি অস্তিত্ব আছে তা বিশ্ব ভুবনব্যাপী। সে অস্তিত্ব বিচিত্ররূপে নিজেকে বিকশিত করেছে; বাইরের পৃথিবী থেকে দৃষ্টিপাত করলে আকাশ এবং ধরতলে এ সৌন্দর্যের বিচিত্ররূপ ধরা পড়ে। আলোকিত ভূ-মণ্ডলে বিচিত্র শোভায় এ সৌন্দর্য দৃশ্যমান, বিচিত্র বর্ণে এবং রূপে এ সৌন্দর্য প্রকাশিত। প্রকৃতিতে বাতাস প্রবাহিত হয়, নদী প্রবাহিত হয়, প্রাণীকূলের কত বিচিত্র কলকণ্ঠ শোনা যায়। এ গুলো সবই বিশ্বভূমার সৌন্দর্যকে প্রমাণিত এবং প্রকাশিত করে। এ সৌন্দর্যের একটি ছন্দ আছে, একটি বর্ণ আছে, একটি উচ্চারণ আছে এবং একটি বিচিত্র বিকাশ আছে। আবার কবিচিত্তের নিভৃতে এ সৌন্দর্য অন্তর্লোকের ধ্যানের মত। বিচিত্ররূপিনী এ সৌন্দর্য অন্তরের মধ্যে একাকী উপলব্ধির মত। একটি চন্দ্র যেমন আকাশে

শান্তভাবে বিরাজমান থাকে তেমনি এ সৌন্দর্য চিত্তের মধ্যে নিমগ্ন একটি অভিসার। কবি এই সৌন্দর্যকে একান্ত আপন করে উপলব্ধি করছেন। কবির নিকট সৌন্দর্য একই সঙ্গে বিচিত্র এবং বহির্মুখী, আবার নিভৃত এবং অন্তর্মুখী।

'সুখ' কবিতাটিতে কবি একটি প্রশান্তির আনন্দকে প্রকাশিত করেছেন এবং প্রকৃতির বহু বিচিত্র উপমা এনে এই প্রশান্তিকে প্রমাণিত করেছেন। যে দিবসের কথা বলছেন সে দিবসটি মেঘমুক্ত এবং মেঘমুক্ত বলেই আকাশ কে প্রসন্ন মনে হচ্ছে। মধুর বাতাসের স্পর্শ শরীরে এসে লাগছে। পদ্মার বুকের উপর দিয়ে পানির তরল কল্লোল তুলে একটি নৌকা ভেসে যাচ্ছে, দূরে অর্ধমগ্ন বালুচর দেখা যায়। নদীর উভয় তীর ঘনছায়াপূর্ণ বৃক্ষরাজিতে আচ্ছন্ন। এই বৃক্ষরাজির মধ্যে অস্পষ্টভাবে গ্রামের কুটির দেখা যায়। গ্রাম্যবধূরা নদীতে স্নান করছে, তীরে বাঁধা একটি নৌকায় বসে একটি বৃদ্ধ জেলে রোদের দিকে পিঠ দিয়ে জাল গাঁথছে, আবার একটি বালক কলহাস্যে পানিতে লাফিয়ে পড়ছে। প্রকৃতির এই দৃশ্যগুলো দেখে কবির মনে শান্তির ধারা প্রবাহিত হচ্ছে। তার মনে হচ্ছে যে সুখ অত্যন্ত সহজ এবং সরল। বাগানে প্রস্ফুটিত একটি পুষ্প যেমন অত্যন্ত সুস্পষ্ট এবং সুন্দর, সুখটাও তেমনি। রবীন্দ্রনাথ শিশুর মুখের হাসির সঙ্গে সুখের তুলনা করেছেন। এই যে আনন্দ যা প্রকৃতির মধ্যে ধরা পড়ে, এবং শিশুর হাসির মধ্যে ধরা পড়ে সে আনন্দ অনির্বচনীয়। কবি 'সুখ' কবিতায় এই আনন্দেরই জয়গান করেছেন। তিনি বলছেন যে চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করে স্থির, শান্ত পরিবেশ লক্ষ্য করে তার মনে হয়েছে যে সুখ অত্যন্ত সহজ ও সরল।

'জ্যোৎস্না রাত্রে' কবিতাটির মধ্যেও একটি নির্জনতার শান্তি এবং স্বস্তি বর্ণিত হয়েছে। রাত্রিবেলা জ্যোৎস্নায় চতুর্দিক প্লাবিত হচ্ছে। সেই সময় কবি জাগ্রত থেকে একটি মৌন শান্ত অসীমতাকে প্রত্যক্ষ করছেন। তিনি বলছেন, "বেদনাদগ্ধ চিত্তের উপর পূর্ণিমা রাত্রি হচ্ছে স্নিগ্ধ অশ্রুপাতের মত। তিনি পূর্ণিমার শান্ত, উজ্জ্বল, বরাভয়ের দ্বারা আচ্ছন্ন হতে চেয়েছেন। রাত্রিতে রজনীগন্ধার সুগন্ধ বাতাসের সঙ্গে প্রবাহিত হচ্ছে এবং সৌন্দর্যের একটি আবেগ যেন সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। নদী নিস্তব্ধ হয়েছে। মনে হচ্ছে সে যেন স্বপ্নে মগ্ন। সমস্ত রাত্রি নিদ্রামগ্ন এবং ঘরে ঘরে রুদ্ধ বাতায়নের আড়ালে মানুষ সুসুপ্তিতে রয়েছে। কবি একাকী জাগ্রত থেকে তার চিত্তের

নিভৃতে অসীম সুন্দরকে অনুভব করতে যাচ্ছেন। জ্যোৎস্নার মদীর মায়ায় যে চতুর্দিক আচ্ছন্ন তার মধ্যে তিনি এক রহস্যময়ীর সন্ধান পাচ্ছেন যে রহস্যময়ীকে তিনি তার অন্তর্লোকে উপলব্ধি করতে চান। এই রহস্যময়ীকে তিনি চিত্তের নিভৃতে চিরকালের জন্য উপলব্ধি করতে চান। কবি মনে করছেন হৃদয়ের নিভৃতে যে নির্জন অঞ্চল রয়েছে সেখানে সৌন্দর্যলক্ষ্মী আসন পেতেছে। সেই সৌন্দর্যলক্ষ্মীর জন্য তিনি জ্যোৎস্নারাত্রে একটি বরণমালা এনেছেন। বিশ্বপ্রাণের অন্তর্ভুক্ত যে বিচিত্র সৌন্দর্য সেই বিচিত্র সৌন্দর্যকে তিনি অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করছেন। জ্যোৎস্নারাত্রে যে দিব্য সৌন্দর্যের জন্য কবিচিত্র উৎসুক এবং উন্মুখ ছিল তাকে কবি 'বিশ্বসোহাগিনীলক্ষ্মী, জ্যোতির্ময়ীবালা' বলে অভিহিত করেছেন।

পরবর্তী কবিতাটির নাম 'প্রেমের অভিষেক'। জ্যোৎস্নারাত্রে যে সৌন্দর্যলক্ষ্মীকে তিনি মাল্য অর্পণ করতে চেয়েছেন, প্রেমের অভিষেকে কল্পনা করেছেন যে সৌন্দর্যলক্ষ্মী সেই মালা গ্রহণ করেছে। মালা গ্রহণ করে প্রেমের অভিষেক ঘটিয়ে সৌন্দর্যলক্ষ্মী কবিকে সম্রাট করেছেন, গৌরবমুকুট পরিয়েছেন শিরে এবং পুষ্প ডোরে তাঁর কণ্ঠ সাজিয়েছেন। জগৎ অত্যন্ত নিষ্ঠুর এবং রূঢ় হলেও এই জগতকে মহিমান্বিত করে প্রেম, যে প্রেম জগতের অভ্যন্তরে ফল্গুধারার মত প্রবাহিত। প্রেমই মানুষকে সৌন্দর্যে মণ্ডিত করে, মহানরূপে বরণ করে। যে মানুষ প্রেমকে গ্রহণ করে সে তার সকল দীনতা এবং হীনতা ভুলে শাশ্বত প্রেমের কাছে আত্মনিবেদন করে। বৈষ্ণব কবিতায় যে তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করা আছে তারই একটি রূপ এই কবিতায় আমরা পাই। পদকর্তা বলছেন হৃদয়মন্দিরে 'কানু' ঘুমিয়ে আছে এবং প্রহরীরূপে রয়েছে প্রেম। সংস্কার এবং বাধা-স্বরূপ যে সমস্ত গুরুজন রয়েছেন তারা প্রেমপ্রহরীর ভয়ে দূরে পলায়ন করেছেন। এখানেও সেই একই কথা বলা হয়েছে—

"হৃদিশয্যাতল
শুভ্র দুগ্ধফেননিভ কোমল শীতল
তারি মাঝে বসায়েছ সমস্ত জগৎ
বাহিরে দাঁড়ায়ে আছে, নাহি পায় পথ
সে অন্তর-অন্তঃপুরে।"

কবিতার প্রথম স্তবক অতিক্রম করেই রবীন্দ্রনাথ দ্বিতীয় স্তবকে পুরাণ এবং উপাখ্যানে কথিত প্রেমিক-প্রেমিকাদের বিবরণ এনেছেন। এই বিবরণটি

মধ্যযুগের রীতি সমর্থিত। মধ্যযুগের কাব্যে বিশেষতঃ হিন্দী-অবধি কাব্যে প্রেম-কাহিনী বর্ণনা করতে গিয়ে কবিরা সর্বদাই উপমা এনেছেন অতীত-কালের প্রেমমূলক ঘটনা থেকে। একই পদ্ধতি অবলম্বন করে রবীন্দ্রনাথ নল-দময়ন্তীর কথা বলেছেন, পুরবা-উর্বশীর কথা বলেছেন, শকুন্তলার কথা বলেছেন, মহাশ্বেতার কথা বলেছেন এবং শিব-পার্বতীর কথা বলেছেন। এ সব কথা বলে বুঝাতে চেয়েছেন যে যিনি যথার্থ প্রেমিক, তিনি এমন এক ভুবনে বাস করেন যে ভুবন একটি অমৃত-আলয়, যে ভুবনে প্রেমিক প্রেমিকাদের লাবণ্যের পরিসীমা নেই। কিন্তু পৃথিবীতে সংস্কার আছে, সাংসারিক অভিঘাত আছে, অনুগ্রহ ও অবহেলা আছে কিন্তু যিনি প্রেমিক তিনি এগুলোর মধ্যে বিদ্যমান থেকেও প্রেমের আনন্দে আত্মহারা থাকতে পারেন। পৃথিবীতে যারা তাকে ঘিরে থাকে তারা অনুভব করতে সক্ষম হয় না যে প্রেমিক ব্যক্তি তার অন্তরে প্রেমের কি উপঢৌকন ধারণ করে আছে। প্রেম একটি পুণ্যের মত যে পুণ্যকে অধিকার করে একজন প্রেমিক সম্রাট হয়। এ কবিতাটিতেও রবীন্দ্রনাথ বহির্জগৎ এবং অন্তর্জগতের একটি দ্বৈততা নির্মাণ করেছেন। কিন্তু উভয় জগৎ মিলেই যে পরিপূর্ণতা তাও তিনি স্বীকার করেছেন।

'সন্ধ্যা' কবিতাটি একটি প্রকৃতি-বর্ণনা। কবি দিবসের শেষে সন্ধ্যার আগমনকে স্বাগত জানাচ্ছেন। সন্ধ্যাকে তিনি শান্তির সঙ্গে তুলনা করে-ছেন এবং একপ্রকার পবিত্র মৌনতার সঙ্গে তুলনা করেছেন। সন্ধ্যায় দিব-সের কোলাহল থাকে না, সুতরাং বিদ্রোহ থাকে না। সন্ধ্যা সমস্ত পৃথিবীর উপর একটি মৌনতার আস্তরণ বিছিয়ে দেয়। সন্ধ্যাকালেই একান্তে সান্ত্বনার স্পর্শ পাওয়া যায়। নদীতীরে গ্রাম সুপ্তপ্রায়, পক্ষীকুল তাদের কুলায় চলে গেছে, শিশুরা খেলছে না, গৃহকার্য সমাপ্ত হয়েছে। নিস্তব্ধতার এই অঙ্গী-কারে জীবন স্তব্ধ এবং শান্ত হয়ে রয়েছে। কবি এই কবিতায় সন্ধ্যার নিশ্চেতন শান্ত নির্জনতাকে অপূর্ব ভঙ্গীতে বর্ণনা করেছেন। 'সুখ', 'জ্যোৎস্না রাত্রে,' প্রেমের অভিষেক', এবং 'সন্ধ্যা'—সবকটি কবিতা পয়ারের প্রবহ-মানতা অবলম্বন করে রচিত। অবশ্য চরণে চরণে অন্ত্যমিল রয়েছে। এই মিলগুলো অত্যন্ত স্বাভাবিক সহজ এবং নিশ্চিন্তভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 'চিত্রা'র পূর্ববর্তী রচনাগুলিতে এই ধরনের মিলে কখনো কখনো দ্বিধার আভাষ পাওয়া যেত। কিন্তু এই কটি কবিতায় সেই দ্বিধা নেই। আরেকটি জিনিস এখানে লক্ষযোগ্য তা হচ্ছে কবির চিত্রাংকন প্রক্রিয়া। অসাধারণ

দক্ষতার সাথে কবি প্রকৃতির ছবি এঁকেছেন যেখানে সম্মুখের চিত্রসহ পশ্চাতের পরিপ্রেক্ষিতে অংকিত হয়েছে। বর্ণবিন্যাসের কৌশলটিও লক্ষণীয়। নীল, লাল ও ধূসর বর্ণের প্রলেপ তিনি এখানে এনেছেন। সংক্ষেপে বলা যায় যে রবীন্দ্রনাথ কাব্যকৌশলতার একটি পূর্ণতার পরিচয় দিয়েছেন এই কয়েকটি কবিতায়। প্রকৃতির নির্জনতাকে যে লাবণ্যে তিনি ভূষিত করেছেন তা অনন্যসাধারণ।

'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায় কর্মজীবনের বিচিত্রের ডাক পড়েছে বলে রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের কবিতার মধ্যে এই কবিতাটি এককভাবে উল্লেখযোগ্য। যে সৌন্দর্যলোক নিরুদ্দেশ এবং যাকে উপলব্ধি করতে হয় নিভৃতে অন্তরের অন্তঃস্থলে সেই সৌন্দর্যলোক থেকে কবি বাস্তব জীবনের সুখ-দুঃখের তরঙ্গের অভিঘাতে উপনীত হতে চেয়েছেন। জীবনের একটি কর্মসাধন আছে, জীবনের একটি গতি আছে, জীবনে আঘাত আছে, সংঘর্ষ আছে, আবার প্রত্যয়ও আছে। এই জীবনের মধ্যে কবি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চান, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে লক্ষযোগ্য যে কবি জীবনের কর্মচাঞ্চল্যের মধ্য থেকে জীবনদেবতার অন্বেষণও এখানে করেছেন। 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতাটির ছন্দ, সুর ও ভাব এ পর্যন্ত লিখিত রবীন্দ্রনাথের কবিতা থেকে পৃথক। কবিতাটির মধ্যে একটি ক্ষুব্ধতা লক্ষ্য করি, স্পর্শকাতর চিত্তের আর্তস্বর লক্ষ্য করি এবং একটি বেদনার অভিমান লক্ষ্য করি। উদাহরণস্বরূপ নিম্নের কয়েকটি চরণ উল্লেখ করা যেতে পারে—

ওরে তুই ওঠ্ আজি।
আগুন লেগেছে কোথা! কার শঙখ উঠিয়াছে বাজি
জাগাতে জগৎ জনে! কোথা হতে ধ্বনিছে ক্রন্দনে
শূন্যতল! কোন অন্ধ কারা-মাঝে জর্জর বন্ধনে
অনাথিনী মাগিছে সহায়! স্ফীতকায় অপমান
অক্ষমের বক্ষ হতে রক্ত শুষি করিতেছে পান
লক্ষ মুখ দিয়া! বেদনারে করিতেছে পরিহাস
স্বার্থোদ্ধত অবিচার; সংকুচিত ভীত ক্রীতদাস
লুকাইছে ছদ্মবেশে!

বহুদিন পরে কবি একটি প্রবন্ধে এই কবিতাটি সম্বন্ধে লিখেছেন, "যে শ্রেয় মানুষের আত্মাকে দুঃখের পথে অভয় দিয়ে এগিয়ে চলে সেই আশ্রয়কে

শ্রেয় করেই প্রিয়াকে পাবার আকাঙ্ক্ষাটি 'চিত্রা'র 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতাটির মধ্যে সুস্পষ্ট ব্যক্ত হয়েছে। বাঁশীর সুরের প্রতি ধিক্কার দিয়েই সে কবিতার আরম্ভ। মাধুর্যের যে শান্তি এ কবিতার লক্ষ্য তা নয়।···বিরাট চিত্তের সঙ্গে মানবচিত্তের এই সংঘাত যে কেবল আরামের, কেবল মাধুর্যের তা নয়। অশেষের দিক থেকে যে আহ্বান এসে পৌঁছয়, সে তো বাঁশীর ললিত সুরের নয়,···এ আহ্বান তো শক্তিকেই আহ্বান—কর্মক্ষেত্রেই এর ডাক, রসসম্ভোগের কুঞ্জকাননে নয়।''

পৃথিবীর মানুষের দুঃখ দূর করবার জন্য কবির মনে এই যে আগ্রহ এর পশ্চাতে একটি রাজনৈতিক চৈতন্য কাজ করেছে বলে রবীন্দ্রনাথের জীবনীকার প্রভাতকুমার বলেছেন। তিনি বলেছেন যে রবীন্দ্রনাথের 'রাজনীতির দ্বিধা' নামক প্রবন্ধে এই চৈতন্যের আভাষ পাওয়া যায়। 'রাজনীতির দ্বিধা' প্রবন্ধটি একই সময়ে প্রকাশিত হয়েছিল 'সাধনা' পত্রিকায়, পরে প্রবন্ধটি 'রাজা ও প্রজা' গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়।

'এবার ফিরাও মোরে' কবিতাটিকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম ভাগটির আরম্ভ 'সংসারে সবাই যবে সারাক্ষণ শতকর্মে রত' থেকে এবং শেষ হচ্ছে 'শত শত অসন্তোষ মহাগীতে লভিবে নির্মাণ' চরণটিতে। এ পর্যন্ত আমরা লক্ষ্য করি যে কবি কর্মহীন জীবনকে অস্বীকার করছেন এবং কর্মপূর্ণ জীবনের অঙ্গীকার ঘোষণা করছেন। যে মানুষ নির্জনে একান্তে অন্তর্লীন চৈতন্য নিয়ে বসবাস করছে তাকে তিনি তার নিভৃতলোক পরিহার করে পৃথিবীর কোলাহলের মধ্যে নেমে আসতে বলছেন যেখানে মানুষ আশ্রয়হীন, যেখানে বেদনায় মানুষ জর্জরিত, যেখানে অক্ষম নির্যাতিত হচ্ছে, যেখানে স্বার্থান্বেষীরা সকল সম্পদ কুক্ষীগত করছে, যেখানে হতাশগ্রস্থ মানুষ কোন প্রতিবাদ না করে ম্রিয়মাণ হয়ে বেঁচে আছে—এখানে উপস্থিত হবার আহ্বান কবি জানাচ্ছেন। বলছেন যে যারা মূঢ়, মূক এবং ম্লান তাদের মুখে ভাষা দিতে হবে। আরো বলছেন যে, যে-সমস্ত মানুষ হতাশাগ্রস্ত এবং শ্রান্ত তাদের সবাইকে আশ্বাস দিতে হবে। নিরাশ্রিত জনকে জাগিয়ে তুলতে হবে যেন সে অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়। তিনি নিজের কথা বলতে গিয়ে বলছেন যে তিনি আর কল্পনার আশ্রয় নিয়ে বেঁচে থাকতে চান না, তিনি সংসারে কর্মকোলাহলের মধ্যে প্রত্যাবর্তন করতে চান। তার সঙ্গীত এবং বাণী নিভৃতলোকের না হয়ে তা যেন মৃত্যুঞ্জয়ী আশার সঙ্গীতে পরিণত হয়।

কবিতাটির দ্বিতীয় পর্যায় আরম্ভ হয়েছে 'কী গাহিবে কী শোনাবে' থেকে এবং শেষ হয়েছে 'তৃপ্ত হবে এক প্রেমে জীবনের সর্ব প্রেম তৃষ্ণায়'— এই চরণে। এই অংশে একটি তত্ত্বকথা এসেছে। তিনি এখানে বলছেন যে তিনি তার কাজে অভিসারে যাবেন। জীবন সর্বস্ব ধন জন্ম জন্ম ধরে যার কাছে অর্পণ করেছেন তার কোন পরিচয় তিনি দিতে পারছেন না। কিন্তু তিনি জানেন যে অন্তরের প্রদীপখানি জ্বালিয়ে তাকে অবলোকন করা যায়। রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় এবং কল্পনায় এ অস্তিত্বটি হচ্ছে জীবনদেবতা। কিন্তু তিনি জীবনদেবতাকে সকল ভাবেই আরাধ্য দেবতা হিসাবে গণ্য করেছেন। অর্থাৎ এখানে জীবনদেবতা পরম সত্য বিধাতায় পরিণত হয়েছে। তিনি বলছেন যে এরই জন্য রাজপুত্র ছিন্ন-কন্থা পরিধান করেছে এবং বিষয়ে বিবাগী হয়েছে, পৃথিবীতে যারা মহাপ্রাণ তারা এরই জন্য উৎপীড়ন সহ্য করেছেন এবং পরিহাস সহ্য করেছেন; এরই জন্য মানী ব্যক্তি তার মান সমর্পণ করেছেন এবং ধনী অর্থ সমর্পণ করেছে এবং যারা বীর তারা আত্মপ্রাণ উৎসর্গ করেছে। এরই অস্তিত্বকে অন্তরে জাগ্রত রেখে প্রতি দিবসের কর্মে নিজেকে নিমজ্জিত রাখতে হবে। দ্বিতীয় অংশের এই তত্ত্বকথাটি কবিতার প্রথম অংশের জন্য অনভিপ্রেত মনে হয়। এখানে কবি জীবনদেবতাকে নিয়ে এসেছেন আবার সেই জীবন-দেবতাকে পরম বিধাতার সঙ্গে একাকার করে সংসারত্যাগের কথাও বলেছেন। কবিতার প্রথম অংশের সঙ্গে এর কোন সঙ্গতি নেই। আবার শেষের দিকে উভয় অনুভূতিকে মিভূলিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন এ কথা বলে যে অন্তর্লীন চৈতন্যে জীবনদেবতাকে সযত্নে অধিষ্ঠিত রেখে প্রতি দিবসের কর্মে ব্যাপৃত থেকে সকল মানুষেক সুখী করতে হবে। এভাবে উভয় ভাবের সমন্বয়ের চেষ্টাটি খুব যে যুক্তিযুক্ত হয়েছে তা মনে হয় না। কিন্তু শব্দ ব্যবহারের সাবলীলতা এবং ছন্দের নিরঙ্কুশ গতি কবিতাটিকে অসাধারণ রূপে পাঠযোগ্য করেছে। আঠার মাত্রার দীর্ঘপদী পয়ারে দুটি পর্বে ভাগ আছে। প্রতি পর্বে আটটি করে মাত্রা। দীঘপদী হওয়া সত্ত্বেও এ ছন্দে রবীন্দ্রনাথ একটি দ্রুতি সম্পাদন করেছেন যার ফলে কোথাও স্তব্ধ হওয়ার অবকাশ থাকে না। শুধুমাত্র ছন্দের এই বিকাশ এবং শব্দ প্রয়োগের নির্ভাবনা কবিতাটিতে একটি বিস্ময়কর দীপ্তি এনেছে যা যথার্থই প্রাণময় এবং উজ্জ্বল।

'স্নেহস্মৃতি', 'নববর্ষে', 'দু'সময়', 'মৃত্যুর পরে', 'ব্যাঘাত'-এ কয়টি কবিতা একই সময়কালীন বলে 'চিত্রা'র অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। 'চিত্রা'র মূল

সুরের সঙ্গে এগুলোর কোন সঙ্গতি নেই। কোন বিশিষ্টার্থক ভাব এবং ভঙ্গি এ কবিতাগুলোতে নেই। শব্দ ব্যবহারেও শিথিলতা লক্ষ্য করা যায়। এ কয়টি কবিতার পরে 'অন্তর্যামী' কবিতাটি 'চিত্রা'র মূলসুরকে আবার নতুন করে ধারণ করেছে। এ কবিতাটিতে কবি তার মনের আনন্দে জীবন-দেবতার বন্দনা করেছেন। জীবনদেবতা হচ্ছে কবির সকল প্রেরণার উৎস এবং তিনি অনুভব করেছেন জীবন দেবতাই তার বক্তব্য কবির ওষ্ঠে তুলে দেন। তিনি বলছেন যে তার অন্তরের মধ্যে বসতি করে অন্তর্যামী হয়ে তাঁর মুখ থেকে ভাষা কেড়ে নিয়ে জীবনদেবতা কথা বলে ওঠে। সুতরাং কবি যা বলতে চান সেটা আর মুখ্য থাকে না, মুখ্য হয়ে ওঠে অন্তর্যামী যা বলাতে চান তাই। কবি হয়তো ঘর-সংসারের কাহিনী আপনজনের কাছে বলতে চাচ্ছিলেন তখন সে ভাষা একটি নতুন রূপ ধারণ করে জীবন-দেবতার প্রত্যক্ষ প্রেরণায় নতুন বাক্‌প্রতিমা নির্মাণ করে। মূলতঃ এ কবিতা-টিতে কবি তার কবি-প্রেরণাকে নানাভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। যথার্থই তিনি সে সময় বিপুল প্রেরণার মধ্যে বাস করছিলেন। শব্দের পর শব্দএসেছে বিরামহীনভাবে এবং ছন্দ ও সুরের অপূর্ব বিন্যাসে তা এক মহিমান্বিত বাণীবন্ধ রচনা করেছে। চতুর্দিকের প্রকৃতি কবিকে উপমা এনে দিয়েছে এবং নবনবরূপে রূপময়কে তিনি রূপ দিয়েছেন। এই কবিতায় মাত্রাবৃত্ত ছন্দের লীলাময় পদ-ঝংকার পাঠককে মুগ্ধ করে। এ কবিতাটিতে কবি-চিত্তের একটা দ্বৈততা আছে। তিনি অনুভব করছেন যে তার মধ্যে দুটি পৃথক সত্তা আছে, একটি হল বাইরের সত্তা আর একটি হচ্ছে অন্তঃপুর-বাসী সত্তা। কবির ভাষায় "আমার মধ্যে যে দুটি প্রাণী আছে বাইরের আমি এবং আমার অন্তঃপুরবাসী আত্মা—এই দুটিতে মিলে সমস্ত ঘরটি দখল করে বসে থাকে।" এ-সময়কার একটি পত্রে এই দ্বৈততার ব্যাখ্যা আছে, "নিজের ভিতরকার এই অপার রহস্যের কথা মনে করলে ভারি ভয় হয়—কী করতে পারব না পারব কিছুই জোর করে বলতে পারিনে—জানিনে আমাকে কোথায় নিয়ে যাবে আমিই বা একে কোথায় নিয়ে যাব?···অসংখ্য কাণ্ড আমাকে অবিশ্রাম আচ্ছন্ন করে ঘটছে, আমি দেখতেও পাচ্ছিনে। আমার সঙ্গে পরামর্শও করচে না···। আমি তো ভেবে চিন্তে এইটুকু ঠিক করেছি আমি নিজেকে কিছুই জানিনে। আমি একটা সজীব পিয়ানো যন্ত্রের মতো ভিতরে অন্ধকারের মধ্যে অনেকগুলো তার এবং কলবল আছে—কখন কে এসে বাজায় কিছুই জানিনে—কেন বাজে তাও সম্পূর্ণ বোঝা শক্ত—কেবল কী বাজে সেইটেই জানি।"

'অন্তর্যামী' কবিতা রচনার প্রায় দশ বছর পরে রবীন্দ্রনাথ তার একটি আত্মকথা রচনা করেন 'আত্ম-পরিচয়' নামে। তাতে তিনি কবিতাটির দীর্ঘ দার্শনিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের চিত্ত-বিকাশ বুঝবার জন্য এ ব্যাখ্যাটির খুব যে প্রয়োজন তা মনে হয় না। কেননা এ কবিতাটির স্বাদ ব্যাখ্যা ছাড়াই গ্রহণ করা যায় এবং 'চিত্রা'র কবিতাগুলি রচনা কালে কবির জীবনে বহির্লোক এবং অন্তর্লোকের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব এবং সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তার পরিপ্রেক্ষিতে কবিতাটি উপভোগ করা যায়। কবিতাটির ছন্দ গতিময় এবং প্রাণোদ। বিভিন্ন স্তবকে বিন্যস্ত হয়ে মাত্রাবৃত্ত ছন্দ ভাবপ্রবাহের যে গতিধারা নির্মাণ করেছে, তারমধ্যে একটি নিরলস সুর ও ঝংকারের ব্যাপ্তি আছে।

'সাধনা' কবিতাটি 'অন্তর্যামী' কবিতাটির পরিপূরক। 'অন্তর্যামী' কবিতাটিতে যে প্রেরণাদায়িনী শক্তির ব্যাখ্যা করেছেন, 'সাধনা' কবিতায় সে শক্তির কাছে কবি অর্ঘ্য নিবেদন করছেন। তিনি বলছেন যে, তাঁর আরাধ্য দেবীর কাছ অনেকেই অনেক রকম অর্ঘ্য এনেছে কিন্তু তিনি এনেছেন তার মনের বাসনার ব্যর্থতাকে। অর্থাৎ তাঁর আকাঙ্ক্ষা ছিল অনেক কিন্তু আকাঙ্ক্ষা পূরণের সাধ্য ছিল না। তবুও এই অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষাকে তিনি আরাধ্য দেবীর চরণে অর্ঘ্য স্বরূপ অর্পণ করছেন। আন্তরিক ইচ্ছাটাই সবচেয়ে বেশী মূল্যবান। কবি তাঁর আন্তরিক ইচ্ছাটাকেই নিবেদন করেছেন দেবীর চরণতলে। কবিতাটির সবশেষ স্তবকে কবি বলছেন যে জীবনভর তিনি অনেক গান গেয়েছেন, সে গান তিনি দান করেছেন বিশ্বের মানব-সমাজকে। কারো হয়তো ভাল লেগেছে, কারো হয়তো ভাল লাগেনি, কিন্তু তার নিবেদনের মধ্যে কোন ত্রুটি ছিল না। তাঁর কাজে ও কথার মধ্যে কোন ব্যবধান ছিল না, যা তিনি বলেছেন তাই তিনি করেছেন এবং তার সর্ববিধ কর্ম ছিল সকলের জন্য। দেবীর কাছে নিবেদনের জন্য তাঁর এখন আছে অগীত গান, অকথিত বাণী এবং বিফল বাসনাগুলো। এগুলোই তিনি দেবীর পায়ে অর্ঘ্য স্বরূপ নিবেদন করছেন। এগুলি যদি গৃহীত হয় তাহলে তিনি তাঁর জীবন সফল মান্য করবেন।

এই কবিতাটিতে স্তবক নির্মাণের একটি সফল প্রয়াস আমরা লক্ষ্য করি। তিনটি স্তবকের মধ্য দিয়ে তার বক্তব্যের তিনি প্রতিষ্ঠা ঘটিয়েছেন। মিলের পারম্পর্য এবং চরণ বিন্যাসগুলি কবিতাটিকে একটি সুস্পষ্ট গতি দিয়েছে। কতকগুলো শব্দ এবং বাক্যাংশের পুনরাবৃত্তি কবিতাটিকে একটি মাধুর্য দিয়েছে যার সাহায্যে নিবেদন বা প্রার্থনা সুষ্ঠুভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

এই কবিতাটির পরে 'শীতে ও বসন্তে' এবং 'নগরসঙ্গীত' নামে দুটি তাৎপর্যহীন কবিতা আছে। এ দুটি কবিতা 'চিত্রা'র মূল সুরের সাথে সঙ্গতি রক্ষা করে না। 'শীতে ও বসন্তে' কবিতাটি একটি পরিহাসচটুল কবিতা। 'নগরসঙ্গীত' কবিতাটির মধ্যে কর্মের উদ্দীপনার কথা আছে যে উদ্দীপনা 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতার প্রথম ভাগে পেয়েছি। কবিতাটি আবেগময় এবং উচ্ছ্বাসের প্রাচুর্য প্রবল। এখানে বৃহত্তর কর্মে একটি পরিতৃপ্তির সন্ধান তিনি করেছেন, তবে শিল্পী হিসেবে কবিতাটির মধ্যে প্রয়োজনাতিরিক্ত বাহুল্য উচ্ছ্বাস এনেছেন, যে কারণে কবিতাটি শিল্পসঙ্গত সীমার মধ্যে গড়ে উঠতে পারেনি।

পরবর্তী কবিতাটি 'পূর্ণিমা'। এ কবিতার মধ্যে একটি নির্জনতার সৌভাগ্য কবি নির্মাণ করেছেন। অনন্ত আকাশ ভরা পূর্ণিমা নির্জন রাত্রে কবিকে যখন আপ্লুত করেছে তখন আলোকিত অসীম নিঃশব্দতার মধ্যে কবি একটি নতুন সৌন্দর্যকে অনুভব করেছেন। এই কবিতাটিতেও বিশ্ব-ব্যাপিনী লক্ষ্মীকে অনুভব করবার চেষ্টা রয়েছে।

'চিত্রা' কাব্যগ্রন্থের 'আবেদন' কবিতাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কবিতাটি নাট্যরূপে গ্রথিত অথবা বলা যায় সংলাপের ভঙ্গিতে প্রতিষ্ঠিত। এক রানী তার রাজ দরবারে বিভিন্ন প্রার্থীকে বিভিন্ন দ্রব্য দান করেছেন। যখন দরবার শেষে দরবার ভঙ্গ করবেন তখন তার ভৃত্য এসে প্রার্থনা করলো যে সে রানীর মালঞ্চের মালাকার হবে। তার এই প্রার্থনা রানী পূরণ করলেন। কবিতাটির মধ্য দিয়ে কবি তার সৌন্দর্য-বন্দনাকে একটি নতুন প্রেক্ষাপটে উপস্থিত করেছেন। ভৃত্য অত্যন্ত কৌশলে তার প্রেম নিবেদনকে সফল করেছে। যে অরণ্যপথে রানী প্রত্যূষে সঞ্চরণ করেন এবং তার শরীর আলস্য বায়ুস্রোতে ভাসিয়ে দেন সে বন-বীথিকাকে ভৃত্য নবীন করে রাখবে এই তার প্রার্থনা। সে আরো বলছে যে সন্ধ্যা কালে রানী যে মালাখনি গলায় পরবেন ভৃত্য নিজহাতে সে মালাটি সাজিয়ে আনবে। এইভাবে বিভিন্ন উপকরণের সাহায্যে ভৃত্য তার প্রেমের উপ-ঢৌকনকে নিবেদন করছে। মূলতঃ এই কবিতায় কবি তার সৌন্দর্যলক্ষ্মীর নিকট তার নিবেদনকে মূর্ত করেছেন। একটি পত্রে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "আমি তাহারি কাছে আবেদন করিয়াছি যে তোমার কাছে নানা লোক নানা বড় বড় পদ পাইয়াছে আমি তাহার কোনটাই চাই না, আমি তোমার মালঞ্চের মালাকার হইব, আমি তোমার নিভৃত সৌন্দর্যরাজ্যে তোমার গোপন

সেবায় নিযুক্ত থাকিব।" রচনাবলীতে 'চিত্রা'র ভূমিকায় তিনি বলছেন, "কর্মক্ষেত্রে যেখানে কার্যক্ষেত্রের জনতায় কর্মীরা কর্ম করছে, সেখানে আমার স্থান নয়। আমার স্থান সৌন্দর্যের সাধকরূপে একা তোমার কাছে।" এ কবিতাটিতে স্পর্শের এবং গন্ধের অনুভূতিকে কবি অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে শব্দে সমর্পণ করেছেন, যেমন—

যেথায় নিভৃত কক্ষে ঘন কেশপাশ
তিমির নির্ঝরসম উন্মুক্ত উচ্ছ্বাস
তরঙ্গকুটিল এলাইয়া পৃষ্ঠ 'পরে
কনক মুকুর আধো, শুভ্র পদ্মাকরে
বিনাইবে বেণী। কুমুদসরসীকূলে
বসিবে যখন সপ্তপর্ণতরুমূলে
মালতীদোলায় পত্রচ্ছেদ-অবকাশে
পড়িবে ললাটে চক্ষে বক্ষে কেশবাসে
কৌতূহলী চন্দ্রমার সহস্র চুম্বন,
আনন্দিত তনুখানি করিয়া বেষ্টন
উঠিবে বনের গন্ধ বাসনা-বিভোল
নিঃশ্বাসের প্রায়, মৃদ ছন্দে দিব দোল
মৃদুমন্দ সমীরের মতো।

এর পরের কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের অত্যন্ত পরিচিত কবিতা 'উর্বশী'। 'উর্বশী' রচনার সময় রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্যের একটি এ্যাবস্ট্রাক্ট বা বিমূর্ত রূপ কল্পনা করেছেন। নারীর বিভিন্ন সামাজিক পরিচয় আছে, সে-পরিচয়ে সে হয়তো মাতা, কন্যা বা গৃহিনী কিন্তু নারীর অন্য একটি পরিচয় আছে যে-পরিচয়ে সে মোহিনী এবং সাংসারিক সম্বন্ধের অতীত। ইংরেজ কবি শেলী 'ইনটেলেকচুয়াল বিউটি' একটি সৌন্দর্য-তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যেখানে তিনি রমণীকে সৌন্দর্যরূপিণী বলে ব্যাখ্যা করেছেন। সে সৌন্দর্য দেশ-কালকে অতিক্রম করে এবং সাংসারিক পরিসীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকে না। উর্বশীও মূলতঃ তাই। 'উর্বশী'তে রমণী সৌন্দর্যের একটি অনির্বচনীয়তা রূপ পেয়েছে। যে বিশ্ব সৌন্দর্যের কথা রবীন্দ্রনাথ 'চিত্রা' কাব্যগ্রন্থে বারবার বলেছেন সে সৌন্দর্য নৈর্ব্যক্তিক। কিন্তু সেই সৌন্দর্যকে কবি নারীর মধ্যে প্রত্যক্ষ করিয়েছেন। সে নারী এমন একক নারী যে মাতা নয়, কন্যা নয়, বধূ নয়, সে শুধুমাত্র সুন্দরী রূপসী, সে সৌন্দর্যের প্রতীক। সমসাময়িক

একটি পত্রে এ কবিতার ব্যাখ্যাসূত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, "পৌরাণিক উর্বশীর নাম অবলম্বন করিয়া আমি যাহাকে কমপ্লিমেন্ট দিয়াছি তাহাকে অনেক দিন হইতে অনেক কবি কম্‌প্লিমেন্ট দিয়া আসিতেছেন। গেটে যাহাকে বলেন The Eternal woman (Ewige weibliche), তাহাকে উর্বশীমূর্তির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া পুষ্পাঞ্জলি দিয়াছেন। সে আমাদের সহিত কোনরূপ সম্বন্ধে আবদ্ধ নহে, বধূ নহে, মাতা নহে, কন্যা নহে, সে রমণী,—সে আমাদের লজ্জা হরণ করে, সে দিব্যরূপে আমাদের স্বর্গে বিরাজ করে, সে আমাদের ভুলায়; সে আমাদের পৌত্রদিগকেও চঞ্চল করিয়া তুলিবে—অর্জুন তাহার সহিত পূর্বপুরুষগত সম্পর্ক পাতাইতে গিয়াছিলেন সেটা অর্জুনের ভ্রম—তাহার সহিত কাহারও কোন বন্ধন নাই; যে আদিম রহস্য-সমুদ্র হইতে দেবতারা সংসারের সমস্ত সুধা ও বিষ উন্মথিত করিয়া তুলিয়াছিলেন, সেই পিতৃমাতৃহীন গৃহহীন অতল হইতে এই চির-যৌবনা অপ্সরী উঠিয়া আজ পর্যন্ত মুনিদের ধ্যানভঙ্গ, কবিদের কবিত্ব-উদ্রেক এবং দেবতাদের চিত্ত-বিনোদন করিয়া আসিতেছে। সে নৃত্য করে, গান করে, আনন্দ দান করে এবং আমাদের বাসনার চরম তীর্থ স্বর্গলোকে বাস করে। আর একটি woman পৃথিবীতে থাকেন তিনি আমাদের সেবা করেন, কাজ করেন, কল্যাণ বিধান করেন, তিনি আমাদিগকে ভালবাসেন, তাঁহাকে আমরা কাঁদাই, দুঃখ দিই; তিনি তাঁহার অশ্রুধারাধৌত প্রফুল্লতার কিরণে আমাদের এই মাটির ঘরটিকে উজ্জ্বল করিয়া রাখেন। আদর্শ রমণীকে দুই ভাগ করিয়া দেখিলে একভাগে The beautiful এক-ভাগে The good পড়ে। 'উর্বশী' কবিতায় প্রথমোক্তটির স্তবগান আছে—'স্বর্গ হইতে বিদায়' কবিতায় দ্বিতীয়টির উল্লেখ পাওয়া যায়।"

'উর্বশী'তে যে সৌন্দর্যের প্রতিষ্ঠা রবীন্দ্রনাথ ঘটিয়েছেন তা সকল প্রয়োজনের বাইরে একটি সামাজিক সত্তা। সে সৌন্দর্য এমন একটি সৌন্দর্য যার সৃষ্টি বিপুল রহস্য সমুদ্রের গোপন অতলতার মধ্যে। সমস্ত বিশ্ব সৌন্দর্যের দ্যুতি 'উর্বশী'র মধ্যে বিকাশ পেয়েছে যে সৌন্দর্য জলে স্থলে অন্তরীক্ষে বিরাজমান, সে সৌন্দর্যের মূর্তি হচ্ছে 'উর্বশী'। 'উর্বশী'র রূপের একটি অতুলনীয়তা আছে। এই কবিতাটি শিল্পকৌশলের দিক থেকে একটি অপূর্ব সৃষ্টি। আটটি স্তবকে বিন্যস্ত এই কবিতার মধ্য দিয়ে কবি অনন্ত সৌন্দর্যকে ধীরে ধীরে উন্মোচন করেছেন। প্রথম স্তবকে উর্বশীর বন্দনা করেছেন এবং পরবর্তী স্তবকসমূহে উর্বশীর সৌন্দর্যের ব্যাখ্যা উপস্থিত

করেছেন। একটি সুঠাম ঋজু ভঙ্গিতে এবং আনন্দিত উন্মোচনায় উর্বশীর সৌন্দর্য আমাদের সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে। প্রথম স্তবকে উর্বশীর পরিচয়কে অনুভবগ্রাহ্য করবার জন্য কবি কয়েকটি পরিচয় উপস্থিত করেছেন যে পরিচয় উর্বশীর পরিচয় নয়। অর্থাৎ কয়েকটা নেতিবাচক পরিচয়ের সূত্র ধরে আমরা উর্বশী-র যথার্থ পরিচয়কে বিমূর্তভাবে চাক্ষুষ করি। যেমন :

গোষ্ঠে যবে সন্ধ্যা নামে শ্রান্ত দেহে স্বর্ণাঞ্চল টানি
তুমি কোন গৃহপ্রান্তে নাহি জ্বাল সন্ধ্যা দীপখানি,
দ্বিধায় জড়িত পদে কম্প্রবক্ষে নম্র নেত্রপাতে
স্মিতহাস্যে নাহি চল সলজ্জিত বাসরশয্যাতে
স্তব্ধ অধরাতে।
ঊষার উদয় সম অবগুন্ঠিতা
তুমি অকুণ্ঠিতা ॥

'সঞ্চয়িতা'র 'চিত্রা'র অন্তর্ভুক্ত বলে কতকগুলো কাহিনীমূলক কবিতা আছে, যেমন: 'ব্রাহ্মণ', 'পুরাতন ভৃত্য' এবং 'দুই বিঘা জমি'। এগুলো রচনাবলী সংস্করণে 'চিত্রা' থেকে বর্জিত হয়েছে এবং স্থান পেয়েছে 'কথা ও কাহিনী'তে। আমরা তাই 'কথা ও কাহিনী'র আলোচনাসূত্রে এ-কবিতাগুলো সম্পর্কে কিছু বলবার থাকলে বলব।

'স্বর্গ হইতে বিদায়' কবিতাটি 'চিত্রা'র একটি উল্লেখযোগ্য কবিতা। রবীন্দ্রনাথ রচনাবলী-সংস্করণে 'চিত্রা'র ভূমিকায় বলেছেন যে 'স্বর্গ হইতে বিদায়' কবিতার সুর নেমেছে ঊর্ধ্বলোক থেকে মর্ত্যের পথে। স্বর্গে জীবন হচ্ছে অনন্তকালীন। সেখানে আনন্দের একটি অবিরাম প্রবাহ রয়েছে। কিন্তু আনন্দকে অনুভব করবার জন্য কোন নিরানন্দ নেই। আমরা বিপরীতের মাধ্যমে একটি অবস্থাকে অনুভব করতে পারি। কিন্তু বৈপরীত্য যেখানে থাকে না সেখানে কোন অবস্থাকেই যথার্থরূপে অনুভব করা যায় না। তাই কবির কাছে মনে হয়েছে যে স্বর্গবাস একটি নিষ্ঠুর প্রাণহীন বসবাস। তাই তিনি পৃথিবীতে ফিরে আসতে চেয়েছেন যেখানে দুঃখ আছে, দৈন্য আছে, আবার মানবিক মমতার বন্ধন আছে। এই দুঃখ-দৈন্যের পৃথিবীতে মানবিক বন্ধনের মধ্যে তিনি প্রত্যাবর্তন করতে চান।

মানবিক বন্ধনের বর্ণনাটি অত্যন্ত মধুর। একটি গ্রামীণ পরিবারের সহজ নিরীহ এবং শান্ত জীবন-যাপনের মধ্যে একটি বালিকার বধূ হবার

প্রত্যাশাকে কবি পার্থিব বন্ধনের উপকরণ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। বালিকা শৈশব থেকেই প্রার্থনা করে যেন শিবের মত বর সে পায়, সে সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বালিয়ে নিজের ভবিষ্যৎ সৌভাগ্যের স্বপ্ন দেখে। এই বালিকা একদিন গৃহবধূ হয়ে একজনের সংসার নিজ হাতে গড়ে তুলবে। সেই সংসারের আনন্দই কবির কাম্য, স্বর্গের অবিমিশ্র উল্লাস নয়। এই সংসার যাপনের মধ্যে আশীর্বাদ আসবে, নীল আকাশের সূর্যের আলোয়, লোকালয়ের কোলাহলে, তরুশ্রেণীর মধ্যে নিঃশব্দ অরুণোদয়ে এবং শূন্য নদীপাড়ে অবনতমুখী সন্ধ্যায়। রবীন্দ্রনাথের অনিন্দ্যসুন্দর বর্ণনাটি উদ্ধৃতিযোগ্য :

ধরাতলে দীনতম ঘরে
যদি জন্মে প্রেয়সী আমার, নদীতীরে
কোন-এক গ্রাম প্রান্তে প্রচ্ছন্ন কুটিরে
অশ্বত্থছায়ায়, সে বালিকা বক্ষে তার
রাখিবে সঞ্চয় করি সুধার ভাণ্ডার
আমারি লাগিয়া সযতনে। শিশুকালে
নদীকূলে শিবমূর্তি গড়িয়া সকালে
আমারে মাগিয়া লবে বর। সন্ধ্যা হলে
জ্বলন্ত প্রদীপখানি ভাসাইয়া জলে
শঙ্কিত কম্পিত বক্ষে চাহি একমনা
করিবে সে আপনার সৌভাগ্যগণনা
একাকী দাঁড়ায়ে ঘাটে। একদা সুক্ষণে
আসিবে আমার ঘরে সস্নত নয়নে
চন্দনচর্চিত ভালে রক্তপট্টাম্বরে,
উৎসবের বাঁশরি সংগীতে।

কবি চৌদ্দ মাত্রার পয়ারকে অবলম্বন করে তাকে প্রবহমান করেছেন এক চরণ থেকে অন্য চরণে অর্থ ব্যক্ততার প্রয়োজনে। সঙ্গে সঙ্গে চরণান্তের মিলও রক্ষা করা হয়েছে। উভয় ব্যবস্থা বিদ্যমান রেখে কবিতাটিতে শব্দ ব্যবহারের একটি সক্ষম প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। তদুপরি ভাবপ্রকল্পের দিক থেকে কবিতাটিতে নিটোল পূর্ণতা আছে। একটি ভার্স-প্যারাগ্রাফ বা পদ্য-অনুচ্ছেদ পরবর্তী অনুচ্ছেদকে স্বাভাবিক ভাবে অধিগম্য করেছে। তার ফলে কবিতাটির প্রথম চরণ থেকে শেষ চরণ পর্যন্ত বক্তব্যের একটি পূর্ণ বিকাশ এবং প্রতিষ্ঠা ঘটেছে। 'চিত্রা'র অনেকগুলি কবিতায় কবিতাকে

সুদীর্ঘকরণের যে প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় 'স্বর্গ হইতে বিদায়' কবিতায় সে-প্রয়াস নেই।

'দিন শেষে', 'সান্ত্বনা' এবং 'শেষ উপহার'—এই তিনটি কবিতার প্রত্যেকটি একেকটি সহজ স্নিগ্ধ মূর্ছনার কবিতা। এই তিনটির পরে 'বিজয়িনী' কবিতাটি এসেছে। 'বিজয়িনী' কবিতাটি বাংলা কাব্য-সাহিত্যে একটি অসাধারণ কবিতা। অত্যন্ত সার্থকতার সঙ্গে কবি এখানে স্পর্শ ও ঘ্রাণের অনুভূতি শব্দে সমর্পণ করতে সক্ষম হয়েছেন। মানুষ হিসেবে আমাদের ইন্দ্রিয়জ কতকগুলো অনুভূতি থাকে যে অনুভূতির কারণে আমরা মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকি। এই অনুভূতিগুলো হচ্ছে: স্পর্শের অনুভূতি, দেখার অনুভূতি, ঘ্রাণের অনুভূতি, শ্রবণের অনুভূতি এবং স্বাদের অনুভূতি। বাংলা কবিতার এ সমস্ত অনুভূতির প্রথম প্রয়োগ রবীন্দ্রনাথের কবিতায় আমরা পাই। ইংরেজ কবি কীটসের মধ্যে এ সমস্ত অনুভূতির যে-প্রকৃতির প্রয়োগ আমরা লক্ষ্য করি তারই একটি সফল প্রয়োগ বাংলা কবিতায় রবীন্দ্রনাথ এনেছেন। কীট্‌স্ তাঁর *The Eve of St. Agnes* কবিতায় নায়িকা ম্যাডেলিনের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন—

> Anon his heart revives; her vespers done,
> Of all its wreathed pearls her hair she frees;
> Undarps her warmed jewels one by one;
> Loosens her fragrant bodice.

অথবা—

> Soon trembling in her soft and drilly nest,
> In sort of wakeful swoon, perplex'd she lay,
> Until the poppied wormth of sleep appress'd
> Her soothed limbs, and soul fatigued away.

—বর্ণনা দু'টিতে 'উষ্ণ অলঙ্কার', 'সুগন্ধিত গাত্রাবরণ', 'ঘুমের উষ্ণতা' এবং 'বাহুর প্রশান্তি' কথাগুলোতে কবি একটি যৌবনবতী রমণী-শরীরের স্পর্শের উষ্ণতা, ঘ্রাণের সুগন্ধ উপস্থিত করেছেন শব্দের অসাধারণ কারু-কার্যে। রবীন্দ্রনাথও তেমনি, 'বিজয়িনী' কবিতাটিতে স্নানরতা যুবতীর যৌবনময় শরীরের স্পর্শ ও আঘ্রাণের অনুভূতি শব্দের সাহায্যে ব্যক্ত করেছেন, যেমন :

তীরে শ্বেতশিলাতলে সুনীল বসন
লুটাইছে একপ্রান্তে স্খলিতগৌরব
অনাদৃত—শ্রীঅঙ্গের উত্তপ্ত সৌরভ
এখনো জড়িত তাহে—আয়ুপরিশেষ
মূর্ছান্বিত দেহে যেন জীবনের লেশ—
লুটায় মেখলাখানি ত্যজি কটিদেশ
মৌন অপমানে। নূপুর রয়েছে পড়ি,
বক্ষের নিচোলবাস যায় গড়াগড়ি
ত্যজিয়া যুগল স্বর্গ কঠিন পাষাণে।

কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথ যথাথ সৌন্দর্যের একটি ব্যাখ্যা উপস্থিত করেছেন। সৌন্দর্যের অলোকসামান্য একটি সত্তা আছে যা নিজস্ব স্বভাবে এবং প্রকৃতিতে পরিপূর্ণ এবং যা সর্বাংশে কামনা-বাসনামুক্ত। তাই তিনি এ কবিতায় বসন্ত-সখা মদনকে সৌন্দর্যের কাছে পরাভূত করেছেন। মদন চেয়েছিল 'অনিন্দ্য যৌবনা' রূপবতী রমণীর চিত্তে কামনা জাগ্রত করতে কিন্তু সে রমণীর সৌন্দর্যে এত অভিভূত হল যে তীর নিক্ষেপ করতে সে ভুলে গেল এবং তূণ শূন্য করে পুষ্পধনু রমণীর পদপ্রান্তে বিসর্জন দিল।

'চিত্রা'য় রমণী-সৌন্দর্যের আর একটি কবিতা আছে 'রাত্রে ও প্রভাতে' নামে। এই কবিতাটিতে যৌবনবতী রমণীর দু'টি রূপ বর্ণিত হয়েছে। একটি রূপে সে লাস্যময়ী কামপীড়িতা রমণী, অন্য রূপে সংসারে সান্ত্বনা এবং বরাভয় প্রদানকারিণী। উভয় রূপেই যৌবনের বিভা রয়েছে। এই দুই রূপের একটিকে রবীন্দ্রনাথ বলছেন প্রেয়সীর রূপ আর একটি হচ্ছে মঙ্গলময়ী দেবীর রূপ।

জীবনদেবতা নিয়ে আরো দু'টি কবিতা 'চিত্রা'তে আছে—একটির নাম 'জীবনদেবতা', অন্যটির নাম 'সিন্ধু পারে'। রবীন্দ্রনাথ এই দুটি কবিতা সম্পর্কে 'আত্মপরিচয়' গ্রন্থে একটি বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। তিনি লিখেছেন, "যখন যেটা লিখিতেছিলাম তখন সেইটেকেই পরিণাম বলিয়া মনে করিয়াছিলাম। এইজন্য সেইটুকু সমাধা করার কাজেই অনেক যত্ন ও অনেক আনন্দ আকর্ষণ করিয়াছে। আমিই যে তাহা লিখিতেছি, এবং একটা কোনো বিশেষ ভাব অবলম্বন করিয়া লিখিতেছি, এ সম্বন্ধেও সন্দেহ ঘটে নাই। কিন্তু আজ জানিয়াছি সে সকল লেখা উপলক্ষ মাত্র। তাহারা যে অনাগতকে গড়িয়া তুলিতেছে সেই অনাগতকে

তাহারা চেনেও না। তাহাদের রচয়িতার মধ্যে আর একজন কে রচনাকারী আছেন যাঁহার সম্মুখে সেই ভাবী তাৎপর্য প্রত্যক্ষ বর্তমান। ফুৎকার বাঁশির এক-একটা ছিদ্রের মধ্যে দিয়া এক একটা সুর জাগাইয়া তুলিতেছে এবং নিজের কৃর্তৃত্ব উচ্চস্বরে প্রচার করিতেছে, কিন্তু কে সেই বিচ্ছিন্ন সুরগুলিকে রাগিণীতে বাঁধিয়া তুলিতেছে। ফুঁ সুর জাগাইতেছে বটে, কিন্তু ফুঁ তো বাঁশি বাজাইতেছে না? সেই বাঁশি যে বাজাইতেছে তাহার কাছে সমস্ত রাগরাগিণী বর্তমান আছে, তাহার অগোচরে কিছুই নাই।" রবীন্দ্রনাথ সেখানে আরো বলেছেন যে, তাঁর অন্তর্নিহিত যে সৃজনশক্তি যা তাঁর জীবনের সমস্ত সুখদুঃখকে সমস্ত ঘটনাকে ঐক্যদান ও তাৎপর্য দান করছে, তার রূপ-রূপান্তর এবং জন্ম-জন্মান্তরকে একসূত্রে গেঁথে তুলছে; যার মধ্য দিয়ে বিশ্ব চরাচরে তিনি একটি ঐক্য অনুভব করেছিলেন তাকেই তিনি জীবনদেবতা নাম দিয়েছিলেন। 'সিন্ধু-পারে' কবিতাটি জীবনদেবতা শীর্ষক হয়েও একটি স্বপ্নের নির্ভরতায় প্রাণবন্ত হয়েছে। স্বপ্নটিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অন্ধকার শীতের রাতে জনৈকা নীরব রমণীর সঙ্গে ঘোড়ার উপর চড়ে কবি দীর্ঘ যাত্রায় চলেছেন এবং অবশেষে এক মহারানীর প্রাসাদে এসে উপস্থিত হলেন এবং সেখানে সেই মহারানীকে জীবনদেবতারূপে প্রত্যক্ষ করলেন। অর্থাৎ কর্ম-কোলাহলে, নিভৃত চিন্তায়, জাগরণে এবং স্বপ্নে সর্বত্রই তিনি জীবনদেবতাকে অনুভব করছেন।

'চিত্রা'র আর একটি বহুল পরিচিত কবিতা হচ্ছে '১৪০০ সাল'। একটি ইংরেজী কবিতার ভাবানুসঙ্গে রচিত হলেও কবিতাটির নিজস্ব একটি গতিভঙ্গি আছে এবং বাংলা শব্দের আশ্রয়ে কবিতাটি প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। কবিতাটির মধ্যে কবির একটি আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পেয়েছে যে একশ বছর পর তার কবিতা নতুন প্রজন্মের পাঠকদের কাছে যেন গৃহীত হয়।

'চিত্রা' কাব্যগ্রন্থ পর্যালোচনা করলে কয়েকটি বিশিষ্টতা আমাদের লক্ষ্য-গোচর হয়, যেমন—

১. একজন কবির জীবনে অন্তর্লোক ও বহির্লোক বলে দুটি চৈতন্য আছে। একটি চৈতন্য কবিকে অন্তর্মুখীন করে এবং অন্য চৈতন্য তাকে বহির্মুখীন করে। কবি কখনও একটিকে নিয়ে বসতি করেন, কখনও অন্যটিকে নিয়ে। কিন্তু সর্বদাই চেষ্টা থাকে উভয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধনের।

২. জীবনদেবতার অনুভূতি, বৈশিষ্ট্য, সদাচার, আনন্দ ও বেদনা 'চিত্রা' কাব্য ক্ষেত্রে পূর্ণভাবে বিকাশ লাভ করেছে। এর একটি তত্ত্বগত ব্যাখ্যা রবীন্দ্রনাথ দেবার চেষ্টা করেছেন।

৩. শব্দ-ব্যবহারের দিক থেকে 'চিত্রা' একটা পূর্ণকাম কাব্যগ্রন্থ। শব্দগুলো নিজস্ব অর্থ বহন করেও একটি অনন্যসাধারণ প্রজ্ঞার বাহন হয়েছে। ভাষাকে সমর্থ এবং সহজ গতিবিধিসঙ্গত রেখেও প্রতীকের ব্যবহার করা হয়েছে যা অনুপম মাধুর্যমণ্ডিত হয়েছে।

৪. পয়ার এবং মাত্রাবৃত্তের ব্যবহারের একটি কুশলতা এ-কাব্যে আমরা লক্ষ্য করি। রবীন্দ্রনাথ পর্ব ও পদভাগের বিশেষ প্রয়োগের সাহায্যে উভয় প্রকৃতির ছন্দের মধ্যে ব্যবধান কমিয়ে এনেছেন।

৫. শব্দের সাহায্যে মানুষের শরীরী চৈতন্যকে প্রকাশিত করা একটি দুরূহ কর্ম। রবীন্দ্রনাথ এক্ষেত্রে আশ্চর্য সফলতা অর্জন করেছেন। স্পর্শের অনুভূতি এবং ঘ্রাণের অনুভূতি শব্দে এমনভাবে সমর্পিত হয়েছে যে আমরা জীবন ও যৌবনের স্পন্দন প্রত্যক্ষ করি।

৬. সংসারের মমতাবন্ধন, প্রেম ও বেদনাকে এ কাব্যে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কবি বলছেন যে স্বর্গের থেকেও অমৃতময় হচ্ছে দুঃখ-দৈন্যের, হতাশা ও আশ্বাসের, বিভ্রান্তি ও সচলতার পৃথিবী।